১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

ঈদুল আযহা সংখ্যা

The Ahmadi
Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৯ জিলহজ্জ, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ ইখা, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ ঈসাব্দ

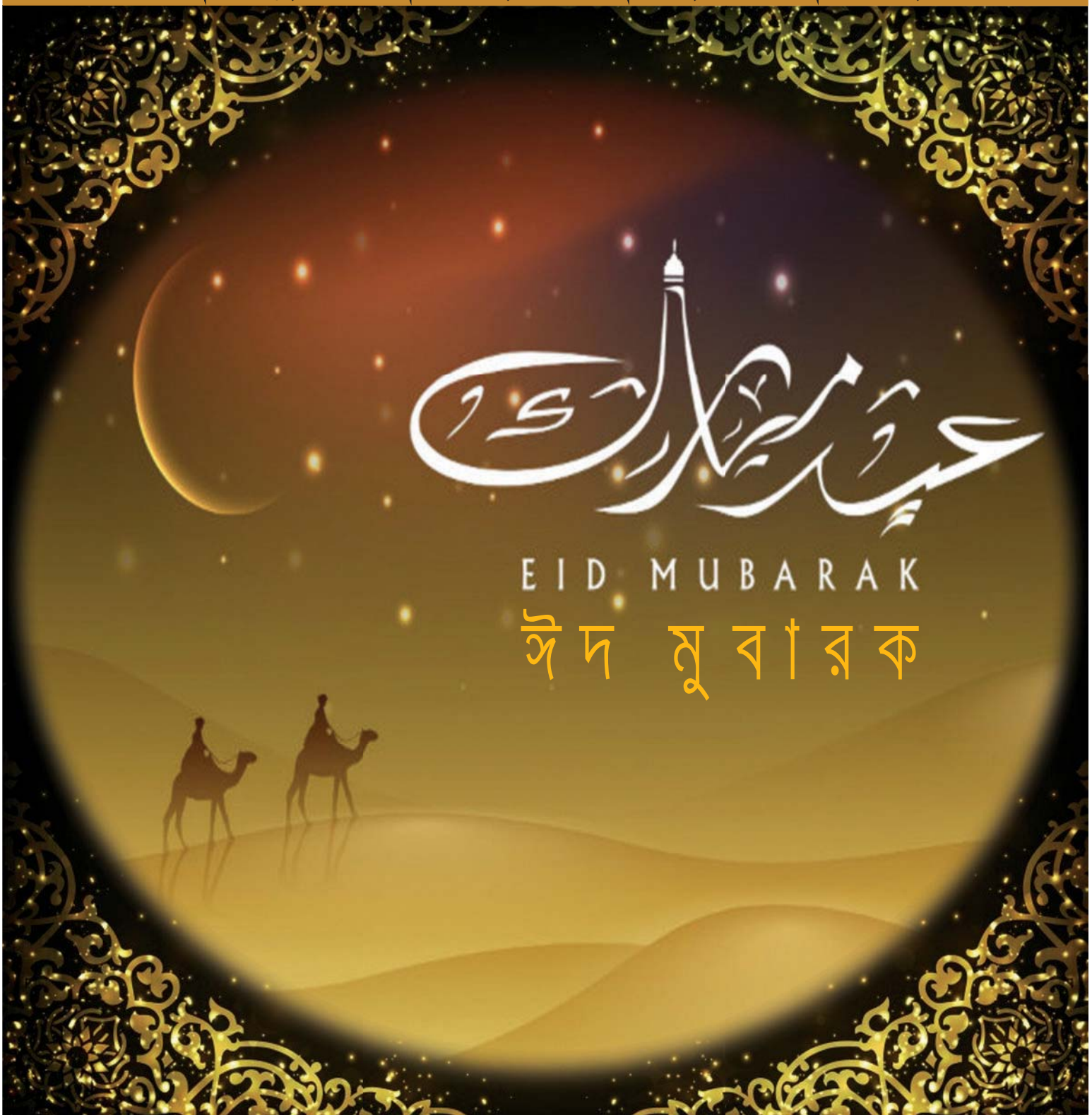

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
“তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।”

(বুখারী ও মুসলিম)।

“বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **‘বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ’** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।
আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

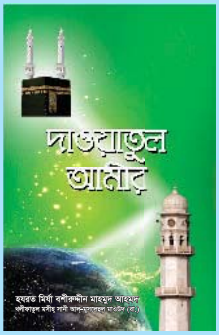

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **‘দাওয়াতুল আমীর’**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

অবাধ্য আত্মাকে জবাই করাই হলো প্রকৃত কুরবানী

কুরবানী: মন্দ কর্মে প্ররোচিতকারী অবাধ্য আত্মাকে জবাই করে-

সেই ইবাদত যা পরকালের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে তা হলো, নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য আত্মাকে জবাই করা। আর এই আত্মা যা মন্দকর্ম করায় বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে আর এই নফসে আম্মারা হলো এমন এক নির্দেশদাতা, যে সর্বক্ষণ মন্দ ও অন্যায় কর্মের আদেশ দিতে থাকে। অতএব, কুরবানীকারী মন্দকর্মের নির্দেশদাতা নফসে আম্মারা-কে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচ্ছিন্নকারী ছুরি দিয়ে জবাই করে দেয়। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ: ৩৫)

কুরবানী আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের বাহন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'প্রকৃত কুরবানী হলো এমন এক বাহন যা খোদা তা'লার নৈকট্যে পৌঁছায়। আর ভয়, শঙ্কাকে প্রশমিত করে কুরবানীদাতার বিপদাবলী নির্বাসিত করে ছাড়ে। এজন্য কুরবানী যথার্থই আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের মাধ্যম। (খুতবা ইলহামীয়া, পৃ: ৪৪-৪৫)

কুরবানী: জীবন ও মরণ-কে জুড়ে দেয়

অতএব, ঐ গোপন রহস্যের প্রতি খোদা তা'লার কালাম ইঙ্গিত দেয়, চির সত্যের ধারক যিনি। তিনি তাঁর রাসূল (সা.)-কে নির্দেশ করে বলেন ঐসব লোকদেরকে বলে দাও যে, "আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবিত থাকা, আর আমার মৃত্যুবরণ করা সবটাই খোদা তা'লার জন্য, যিনি জগতসমূহের অধিপতি"।

অতএব অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর ***নুসক*** (কুরবানী) শব্দটিতে ***হায়াত*** (জীবন) ও ***মুমাত*** (মরণ) শব্দ দু'টির সাথে সঠিক ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে কত সুন্দর ও সঠিকভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৩)। অর্থাৎ মরণেই জীবনের উত্থান।

গৃহীত কুরবানী এক সচল ধারা: মহান এক পুরস্কার

কুরবানীর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে স্বচ্ছ অন্তরে নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরবানী করলে কুরবানী দাতা নিজেকে, নিজের পুত্রদেরকে ও পৌত্রদেরকেও কুরবানীতেই অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আর একারণে তার জন্য সম্মানিত মহান এক পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে যায় যেমনটা লাভ হয়েছিলো হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। (খুতবায়ে ইলহামীয়া, পৃ:৪৪)। আর পরিণামে জগত পেয়েছে রহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-কে।

পবিত্র এই কুরবানীর ঈদ, আমাদের করা পশু কুরবানীকে ছাপিয়ে প্রকৃত অর্থেই আমাদের নফসের কুরবানী হয়ে উঠুক আর মহান আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করে আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) করা কুরবানীর পুরস্কারের ভাগী করুন। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত মহান পুরস্কারে উদ্ভাসিত হোক।

সকলকে ঈদ মুবারক

ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মহান পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অনন্য আত্মোৎসর্গের মহিমায় সকলে উদ্ভাসিত হোন এই কামনা করি এবং সেই সাথে পবিত্র ঈদুল আযহা সবার জীবনে বয়ে আনুক অনেক অনেক আনন্দ আর কল্যাণ।

–সম্পাদক

সূচিপত্র

৩০ সেপ্টেম্বর-১৫ অক্টোবর, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ অক্টোবর ২০১৩-এর **ঈদুল আযহা'র খুতবা** ৬

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ নভেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা** ১৩

বিদায় হজ্জ এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভাষণ
হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ২০

"বায়তুল্লাহ্ সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ সুস্পষ্ট এমন নিদর্শন যা ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনের কেন্দ্র মহান উৎস, সর্বকালেই সেটা জীবন্ত" ২২
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক মসজিদ আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত ৫ই জানুয়ারি ১৯৭৪-এর **ঈদুল আযহা'র খুতবা** ৩১

২৭শে মে, ২০১৪ তারিখে খেলাফত দিবস উপলক্ষে এমটিএ'তে সম্প্রচারিত আরবী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা ৩৩

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ৩৬

কুরআন করীমে কুরবানীর পটভূমি
আলহাজ্জ মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান ৪০

নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে নেযামে নও এর প্রতিষ্ঠা
মহিউদ্দিন আহমদ ৪৪

"ভ্রমণ কর পৃথিবীময়"
মাহমুদ আহমদ সুমন ৪৮

মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য বিষয়
মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৫৫

সেটাই প্রকৃত ঈদ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে ৬০
মৌলবী এনামুল হক রনী

পাঠক কলাম- "ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব" ৬১
আনোয়ারা বেগম, ফারহানা মাহমুদ তন্বী, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

সংবাদ ৬৫

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৭১

The War Within Islam ৭৬

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৭৮

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৭৯

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৮০

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ হাজ্জ-২২

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৩৭। আর, যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি, সেগুলোতে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে, তখন তা থেকে খাও, স্বল্পে তুষ্ট (অভাবী)-দেরকেও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরকেও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্‌ওয়া পৌঁছে[১৯৫৫]। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ, তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে সুসংবাদ দাও।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত, যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ-অবস্থার ওপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ-শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না, বরং এই আনুষ্ঠানিকতার ভেতরের তাক্‌ওয়ার প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত-শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, কেবল অন্তরের তাক্‌ওয়াই তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা-কিছু আছে, আল্লাহ্ তা'লা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন–আমাদের পার্থিব সহায়-সম্পদ, প্রিয়-ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ-জীবন পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, বাহ্যিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে-জন্য বাহ্যিক-কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোলসস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ-প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে, কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ, কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক

* হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

* হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে-ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঈদে ধুসর রঙ্গের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি এদেরকে আপন হাতে জবাই করলেন এবং (যবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (যবাই করার সময়ে) উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (মুত্তাফিকুন আলায়হে)।

* হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছর-বয়সী বাচ্চা-ছাগল বাকী থাকল। তিনি তা রসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে , আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (মুত্তাফিকুন আলায়হে)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

* হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন যিলহজ্জ মাসের প্রথম-দশক আসে, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে) । অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কেশ না ছাঁটে এবং নখও না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে-ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছুই না কাটে (মুসলিম)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি, যে-পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পেছনের-দিকে ফিরে গেছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরবানী কী? হুযূর উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের ক্ষেত্রে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরো একটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ। যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। আল্লাহ্ হজ্জের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, যেন সে তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে এবং আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য-রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার বাহ্যিকতার সকল পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকারের-প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী-আইনে হজ্জের প্রকৃত-অর্থ এটাই" ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জব্রত পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত- তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক-কর্ম আধ্যাত্মিক-হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন। কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদের হাজী বলুক, এ-জন্যই অসৎ-উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তারা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক-বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমনভাবে তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত-সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের-আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র।" (মলফুযাত, ২য় খন্ড)

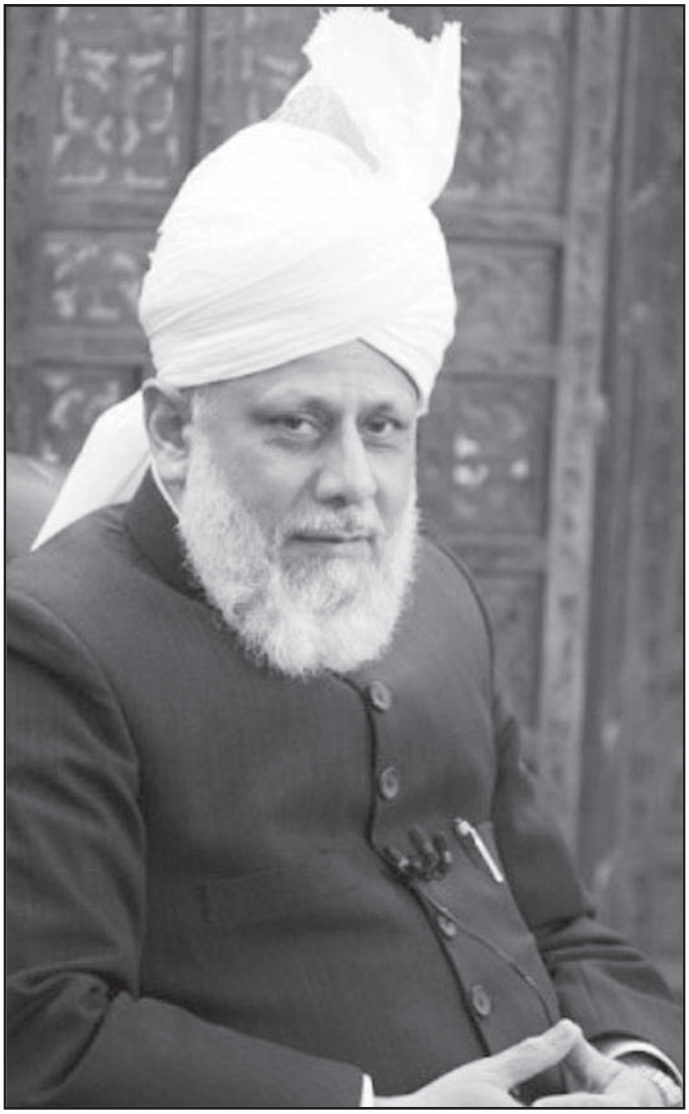

ঈদুল আযহা'র খুতবা

"আমাদের প্রতিটি ঈদই যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়"

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ অক্টোবর ২০১৩-এর ঈদুল আযহা'র খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ
يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ
وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

"লাইয়্যানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিইয়্যানালুহুত তাক্ওয়া মিনকুম কাযালিকা সাখখারাহা লাকুম লিতুকাব্বেরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম ওয়া বাশশেরিল মুহসিনীন।"

এই আয়াতের অনুবাদ হল–"এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও" (সূরা হাজ্জ : ৩৮)।

আজ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের জীবনে আরো একটি ঈদুল আযহা উদযাপনের তৌফিক দান করেছেন। বারবার আগমনকারী জিনিস ও

আনন্দঘন মুহূর্তকেই ঈদ বলে। 'আযহিয়া' শব্দের অর্থ হল সূর্য উদয়ের পর অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া এবং কুরবানীর ছাগলও এর এক অর্থ। যাই হোক, সাধারণত আমরা একে, এই ঈদকে 'কুরবানীর ঈদ' বলে থাকি।

কুরবানীর ঈদ এই নামটি সাধারণত মুসলমানদের মাঝে এই ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, খুশির সময় এসেছে, পশুদের জবাই কর, আনন্দ কর, মাংস খাও আর এটি ঈদ হয়ে গেল। এ কারণে আমরা দেখি যে, এই ঈদে মুসলমানরা লক্ষাধিক সংখ্যায় বরং কোটি কোটি সংখ্যায় পশু জবাই করে থাকে। মক্কায় যেখানে হজ্জ হয়ে থাকে সেখানেই লক্ষাধিক পশু জবাই করা হয়ে থাকে। পাকিস্তান ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশসমূহে যেখানে মুসলমানরা রয়েছে বিশেষ ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের পাকিস্তান ও ভারতে, বিত্তবান লোকদের মাঝে বড় ও খুব সুন্দর পশু কেনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে যে, আমি এত লক্ষ টাকায় এই ষাড় ক্রয় করেছি আর কেউ বলে যে, আমি এত হাজার টাকায় এই ভেরা বা দুম্বা অথবা খাসি ক্রয় করেছি। তারপর একে খুব সুন্দর করে সাজানো হয় এ কারণে যে, এটিও হুকুম রয়েছে যে, খুব সুন্দর কুরবানী দাও।

তাই বাহ্যিকভাবেও একে খুব সুন্দর করার চেষ্টা করে থাকে। আর বাহ্যিকতার ওপরই বেশি জোর দিয়ে থাকে। এমন লোকেরাও কুরবানী করে যারা, না তাদের জীবনে নামায পড়ে আর না তারা রোযা রাখে। এমনকি এমন লোকও রয়েছে যারা হয়তবা বছরে ঈদের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযই পড়েনি। কিন্তু এই বড় বড় কুরবানী তারা অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে উপস্থাপন করে থাকে। তারপর এই কুরবানীর পর তারা ভুলে যায় যে, আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যও রয়েছে। সারাদিনই দাওয়াত খাওয়া আর গল্প-গুজবেই মেতে থাকে। সেইদিন অধিকাংশ লোক নামাযও আদায় করে না আর এভাবেই ঈদ হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,–নি:সন্দেহে এটি কুরবানী ঈদ, নি:সন্দেহে একটি কুরবানী করার অধিকার আদায়কারী পিতা ও পুত্রের স্মরণে প্রত্যেক বছর উদযাপনকারী এটি একটি ইসলামী উৎসব। কিন্তু স্মরণ রাখুন, শুধুমাত্র আনন্দ করা এই কথার ওপর যে, আমাদের বুযুর্গরা চার হাজার বছর পূর্বে কুরবানী উপস্থাপন করেছিল অথবা সেই বুযুর্গ এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতরা কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, এটি যথেষ্ট নয়। সেটিতো সেই খোদা তা'লার প্রেরিতদের কাজ ছিল, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন কাজটিই করেছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই কাজকে কবুলও করেছেন।

পরবর্তীতে তাদের ধারাবাহিক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় পূর্বের ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর চিহ্নিত করে এতে মজবুত দেওয়াল তৈরী করে তাদেরকে আরো একটি মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার এই ঘর পুণর্নির্মাণে এখন তোমরা দু'জন নয় বরং তিনজন, কেননা পিতা, মাতা ও পুত্র এতে যুক্ত হয়ে গেলে, ভবিষ্যতে আগমনকারী লোকদের জন্য তোমাদের সবাইকে তিনি সর্বদা স্মরণযোগ্য বানানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর এর থেকেও বড় পুরস্কার এটি দিয়েছেন যে, এই ঘরের দেওয়াল তৈরীর সময় এই দুই বুযুর্গ হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, আমাদের বংশধরদের মাঝ থেকেও এক মহান নবী প্রেরণ করুন, এই দোয়াকে কবুলিয়্যতের মর্যাদায় ভূষিত করে ঐ মহান নবীকে প্রেরণ করেন যিনি আল্লাহ্ তা'লার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এবং আছেন ও থাকবেন। যার আগমনে আল্লাহ্ তা'লার এই ঘরের গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যিনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করানোর সুউচ্চ মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দুই বুযুর্গকে এবং তাঁদের বংশধরদের সব সময়ের জন্য রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর (সা.) উম্মতের মাধ্যমে প্রত্যেক নামাযের দরূদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর দোয়াতে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

অতএব এটি সেই বুযুর্গদের কুরবানীর ফল ছিল যা তারা লাভ করেছে এবং তারা

"আপনাদের সকলকে এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল আহমদীদেরকেও ঈদ মুবারক। এই ঈদ আমাদের জন্য অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণের উপায় উপকরণ নিয়ে আসুক"

এটি পেয়েই চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা এটি মনে করো না যে, তারা এই পুরস্কার একটি ভেড়া কুরবানী করার কারণে পেয়েছিল আর তোমরাও একটি ছাগল বা ভেড়া বা গরু কুরবানী করে এই পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না তাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত তাদেরকে বা তাদের বংশধরদেরকে এই মর্যাদা দিতে পেরেছে আর না আমার শেষ নবী (সা.)-এর মান্যকারী এবং তাঁর বংশধরদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত লোকদেরকে এই ভেড়া, খাসি ও গরুর কুরবানী করা কোন মর্যাদা দিতে পারবে।

দরূদ শরীফের মাঝে যেই দোয়া 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদঁদেও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ এবং আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ' এই দোয়ার যদি অংশীদার হতে চাও এবং প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে চাও তাহলে সেই তাক্ওয়াহ সৃষ্টি করো যা আল্লাহ্ তা'লা চান। সেই তাক্ওয়া সৃষ্টি করো যা শেষ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত আনয়নকারী নবী হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) সৃষ্টি করার জন্য এসেছিলেন।

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কুরবানীর বাহ্যিক দিক কোন ফলাফল সৃষ্টি করে না বরং সেই আত্মা ফলাফল সৃষ্টি করে থাকে যার সাথে কুরবানী দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, স্মরণ রেখো! তাক্ওয়া ব্যতীত ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না আর না তাকওয়া ব্যতীত এর ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে আর কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, তোমাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত কখনই আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছায় না। তিনি বলেন–***"ওয়ালাকি ইয়ানালুহুত তাক্ওয়া মিনকুম"*** অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়ের তাক্ওয়া আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই কুরবানীসমূহ তা যেভাবেই হোক না কেন, তোমাদের আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছার এটিই মাধ্যম। তবে সেই অবস্থায় যখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জিত হয় বিশেষত তাঁর মাহাত্ম বর্ণনার মাধ্যমে, তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে, যে সকল আদেশ নিষেধ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তার ওপর আমল করার মাধ্যমে, কুরআন করীমে যে সকল আদেশ রয়েছে তার ওপর আমল করার মাধ্যমে। ইসলামের যে সারমর্ম ও মূলবস্তু রয়েছে তা অর্জনের মাধ্যমে। তোমরা এই চিন্তাভাবনা নিয়ে কুরবানী করলে তোমাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, তোমরা খোদা তা'লার সুন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যাবে, অনুগ্রহ বর্ষিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হেদায়াত লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সেই সকল পুরস্কাররাজি অর্জনকারী হয়ে যাবে যা একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ইন্নামাল আ'মানু বিন্নিয়্যাত" অর্থাৎ নিশ্চয় নিয়্যত বা উদ্দেশ্য দ্বারাই কর্ম নির্ধারিত হয়।

অতএব নিয়্যত যদি তাক্ওয়ার ওপর চলা এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধি নিষেধের ওপর আমল করার চেষ্টা প্রচেষ্টা হয় তাহলে এই কুরবানী গ্রহণীয় হবে। তারপর এই কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করাও খোদা তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী বানাবে। আল্লাহ্ তা'লার মাংসের কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, যখন নিয়্যত নেক হয়, খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয় এবং কুরবানী করার পর এর থেকে গরীব ভাইদের অংশ আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ওপর আমল করার নিয়্যতে দেওয়া হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হুকুকুল ইবাদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ তা'লা যিনি ক্ষুধার্তদের খাবার খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তখন এই কুরবানীর বাহ্যিক চর্ম অথবা মাংসেরও প্রতিদান তিনি দিয়ে দেন।

সেই সমস্ত ধনী দেশসমূহে বসবাসকারী যাদের তৌফিক রয়েছে তারা জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে অথবা নিজ ব্যবস্থায় পাকিস্তান এবং গরীব দেশসমূহে কুরবানী করুন। কেননা এমনও অনেক আছে যারা মাসেও একবার মাংস খেতে পায় না আবার কোন কোন সময় কেবল ঈদের সময়ই খেয়ে থাকে অথবা মাসের পরে কোথাও খেয়ে থাকে যেন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারে। এটি আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, এ নিয়্যতেরও প্রতিদান দিচ্ছে আবার অভ্যন্তরের যে নিয়্যত রয়েছে তারও প্রতিদান দিচ্ছে।

যখন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ***"বাশাশেরিল মুহসিনীন"*** কেউ যেন এটি মনে না করে যে, এটি সেই নেকীর কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনুগ্রহকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'মুহসীন' শব্দের অর্থ হল অন্যদের উপকার করা, নেকীর পথে চলা এবং 'মুহসীন' শব্দের আর একটি অর্থ হল জ্ঞানী ব্যক্তি। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা জ্ঞান রাখে এবং যারা এই তত্ত্বকে জানে যে, কুরবানীর রূহ হল তাক্ওয়া, কোন বাহ্যিক কুরবানী নয়। আর এই জ্ঞানের কারণে পুণ্যের দিকে অগ্রগামী হয় এবং আরো সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। পুণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভকারী হয়, হেদায়াত লাভকারী হয় এবং তাঁর পুরস্কারের অংশীদার হয়।

অতএব অনুগ্রহ আল্লাহ্ তা'লার, বান্দার নয় যে, এই আমল যার ভিত্তি তাক্ওয়ার ওপর, এটি আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদের প্রদান করেছেন। একজন প্রকৃত মু'মিন সর্বদা তার সামনে এ বিষয়টিকে রেখে থাকে এবং রাখা উচিত, কেননা তাক্ওয়া ব্যতীত কোন নেকী নেই। এটি কেবল লোক দেখানো মাত্র আর লোক দেখানো নামাযীদের আল্লাহ্ তা'লা শক্তভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ***"ফাওয়াইলুললিল মুসাল্লিন"*** অর্থাৎ দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের জন্য। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া'বুদুন"*** অর্থাৎ আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর ইবাদতের চূড়ান্ত সীমা রসূল করীম (সা.) আমাদের এটি বলেছেন যে, ইবাদতের মগয বা মূলবস্তু হল নামায। অর্থাৎ সকল ইবাদতকারীর মেরাজ হল নামায। তিনি (সা.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "নামায আমার চোখের স্নিগ্ধতার কারণ।" অতএব সেই নামায সমূহ যা এই নিয়্যতের সাথে পড়া হয় যার উত্তম

আদর্শ আমাদের সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন তাহলো, এটি চোখের স্নিগ্ধতার কারণ, ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু বা মূলবস্তুও এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারীও। কিন্তু অপরদিকে যদি এটিকে ছাড়া হয় তবে তা হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দার অধিকার প্রদান করতে নিষেধ করে। একদিকে নামায হচ্ছে আর অন্যদিকে লোকদের ওপর যুলুম অতাচার হচ্ছে তাহলে এটি তাক্‌ওয়ার বাহিরের এবং পরবর্তীতে এটিই ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

“প্রত্যেক কাজ যদি আল্লাহ্ তা’লার খাতিরে করা হয় এবং হৃদয়ে আল্লাহ্ তা’লার ভয় থাকে যে, আমার প্রত্যেক কাজ তিনি দেখছেন, তাহলে প্রত্যেক দিনই হবে কুরবানীর সওয়াবে ভূষিতকারী”

অতএব আমাদের কুরবানী ও ইবাদতসমূহ তাক্‌ওয়া চায়, সেই মানদন্ড চায় অথবা সেই মানদন্ড অর্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা চায় যার উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে আমাদের নেতা ও সর্দার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) উপস্থাপন করেছেন। অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাক্‌ওয়া ব্যতীত না কোন ইবাদত কাজে আসবে আর না কোন কুরবানী কাজে আসবে। এই রূহ আমাদের নিজেদের ভিতরে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সকল বিধি নিষেধের ওপর মনোযোগ দিয়ে দৃষ্টি দেওয়ার পর এতে আমল করার চেষ্টা করতে হবে।

সুতরাং এই ঈদকেও আমাদের সেই ঈদ বানানোর চেষ্টা করা উচিত যার ভিত্তি তাক্‌ওয়ার ওপর। সেই সকল অনুগ্রহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যাদের আল্লাহ্ তা’লা সুসংবাদ দেন। যাদের ভান্ডারগুলোকে নিজের পুরস্কার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরবানী বা নেকী বা অনুগ্রহকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এক দিনের জন্য নয়। যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বলল, “ইয়া আবাতে ইফআল মা তু’মার” অর্থাৎ হে আমার পিতা! তোমাকে খোদা তা’লা যা বলেন, তুমি তাই কর। শুধুমাত্র গলায় ছুরি চালিয়ে এর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য ছিল না। সেই যুগে মানুষের প্রাণের কুরবানী দেয়া হত বা নেয়া হত। এটি সেই যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন নতুন বিষয় ছিল না। অধিকাংশ লোকেরা এবং সেই যুগের লোকেরাও এই কুরবানী সম্পর্কে এটিই বলে থাকে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ্ তা’লার কথায় কুরবানী করিয়েছেন আর পৃথিবীবাসী তা ভুলেও যেত, কিন্তু সেই দুই পিতা পুত্রের মাঝে তাক্‌ওয়ার জ্ঞান ছিল। এ কারণে স্বপ্নের উদ্ধৃতির আলোকে পিতা যখন পুত্রের অভিমত নিল তখন এতে তাক্‌ওয়ার প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন পুত্র শুধুমাত্র এই উত্তর দেয়নি যে, হে আমার পিতা! আমি প্রস্তুত। তুমি আমার গলায় ছুরি চালাও। বরং উত্তর দিয়েছিল–“ইয়া আবাতে ইফআল মা তু’মারু” অর্থাৎ আমার সম্পর্কে যে আদেশই রয়েছে তুমি তা পূর্ণ কর। ছুরি চালানোর আদেশ ছুরি চালাও আর আমার থেকে যদি কুরবানী নিতেই থাক তাহলেও আমি প্রস্তুত।

আমি যেভাবে বলেছি যে, ছুরি চালিয়ে প্রাণ দেওয়ার উদাহরণ তো অনেক বিদ্যমান রয়েছে যা সেই যুগে এই কুরবানী নেওয়া হত। পুত্র এই উত্তর দেয় যে, আমি তো খোদা তা’লার খাতিরে কুরবানীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্যও প্রস্তুত। তারপর আল্লাহ্ তা’লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কেও এটিই বলেন যে, আমি একটি সাময়িক কুরবানী চাচ্ছি না। যাহোক, পিতা পুত্র আনন্দের সাথে এর জন্য প্রস্তুত। আমি তো নিরবচ্ছিন্ন কুরবানী চাচ্ছি, এমন কুরবানী চাচ্ছি, যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। তারপর অনুর্বর উপত্যকায় মরুপ্রান্তরে এই কুরবানীর ধারবাহিকতা চালু হয়েছে।

অতএব এটিই তাক্‌ওয়া যে, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানীর একটি ধারাবাহিকতা চালু হয়েছে। এটিই তাক্‌ওয়া। আল্লাহ্ তা’লার বিধিনিষেধের ওপর আমল করে নিজেদের তাক্‌ওয়ার মানকে উঁচু থেকে উঁচুস্তরে নিয়ে যেতে থাকে। খোদা তা’লার সন্তুষ্টিকে নিজের মুখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নাও। এটি ইসমাঈলী গুণ যা আজকের ঈদে আমাদের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য এসেছে আর এই গুণের মেরাজ আমাদের নেতা ও সর্দার হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে এটি দেখা যায়। যাকে খোদা তা’লা এভাবে সম্বর্ধনা দিয়েছেন যে, তিনি বলেন–“কুল ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ ইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন” অর্থাৎ তুমি বলো যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার

জীবন ও মরণ আল্লাহ্ তা'লার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব এটি সেই মর্যাদা যা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। বাহ্যিকভাবেও এই কুরবানী করা হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি যে, ভেড়া, খাসি, গরু-মহিষের পাল জবাই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সেই মুসলমানকে যাকে তৌফিক দিয়েছেন তাকেও এই বাহ্যিক কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন।

পশু কুরবানীর এই আদর্শ স্বয়ং রসূল করীম (সা.) আমাদের সম্মুখে রেখে গেছেন। অতএব এটিকে বাহ্যিকভাবেও পূর্ণ করা প্রয়োজন। আর কুরআন করীমেরও এটি আদেশ, কিন্তু এই আদেশ শর্তযুক্ত। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কুরবানী ওয়াজেব নয়, শুধুমাত্র যাদের সামর্থ রয়েছে তাদের ওপরই ওয়াজেব কিন্তু তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং খোদা তা'লার জন্য নিজের দায়িত্বাবলী পালন করা এবং বিধি নিষেধের ওপর আমল করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয়। হোক সে গরীব বা ধনী, পুরুষ হোক বা মহিলা অথবা যুবক হোক বা বৃদ্ধ, নামায প্রত্যেকের জন্য ফরজ। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা না হয় তাহলে এই বছরের পরে ঈদে কুরবানী করা কোন কাজে আসবে না। পুণ্য কাজ করতে হবে, ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে হবে যেন নিজেরও তরবীয়ত হয় এবং বাচ্চাদেরও তরবিয়ত হয় আর পরবর্তীতে যেন তবলীগের রাস্তাও খুলে যায়। হুকুকুল ইবাদের আদায়ও হয়, এই সমস্ত বিষয়ের জন্য কোন পশু কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। এই উদ্দেশ্যসমূহতো ভেড়া কুরবানী করা ব্যতীতই অর্জন করা সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন আমলই কুরবানীর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে। একটি ভেড়া বা একটি গরু কুরবানী এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে না।

সুতরাং যাদের দুম্বা বা ভেড়া কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, যার মাধ্যমে তারা বাহ্যিকভাবে কুরবানীর বহি:প্রকাশ করতে পারে, তারা নিজেদের সময়কে ইসলামের তবীগের জন্য উৎসর্গ করুন, লিফলেট বিরতণ করুন, নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের তবলীগ করুন, নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজের চালচলনে এবং আদর্শে লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। সেক্ষেত্রে এই নিরবচ্ছিন্ন আমল পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এটিই একটি কুরবানী।

ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষা পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করুন। খোদা তা'লার ফজলে অনেক আহমদী রয়েছে যারা লাগাতার কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। জীবনের কুরবানী, প্রয়োজন হলে তারা তাদের জীবনেরও কুরবানী দিচ্ছে। আপনাদের মধ্য থেকেও অনেকের প্রিয় পাত্ররা এমন কুরবানী দিয়েছেন যারা বর্তমানে এখানে এসেছেন। পাকিস্তানের আহমদীরাতো নিজের প্রাণ হাতের মুঠোয় রাখে আর সেই প্রাণ কুরবানী করার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছে, কুরবানী করেও থাকে এবং কুরবানী করেই চলেছে। পাকিস্তানে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। এই কুরবানী সমূহ একদিন অবশ্যই তার ফল দিবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এবং শত্রুরা এই পৃথিবীতেই তাদের যন্ত্রণাদায়ক পরিণাম অবশ্য অবশ্যই দেখবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যাহোক একজন মু'মিনের কাছে এটিই প্রত্যাশা যে, সে যেন এই সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে।

যেভাবে আমি বলেছি ঠিক সেভাবে হুকুকুল ইবাদ আদায় করাও এক ধরণের কুরবানী। আমাদের মধ্য থেকে অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে এই অধিকার আদায় করে থাকে কিন্তু এমনও আছে যারা অন্যদের প্রাপ্য অধিকারকে হরণ করছে। তারা লক্ষ লক্ষ কুরবানী করতে থাকুক আর লক্ষ লক্ষ নামায পড়তে থাকুক তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–তোমাদের কুরবানী ও ইবাদতের তিনি কোন পরওয়া করেন না। হ্যাঁ, কিন্তু তা যদি যে কোন ভাবে

"যাদের দুম্বা বা ভেড়া কুরবানী করার সামর্থ্য নেই, যার মাধ্যমে তারা বাহ্যিকভাবে কুরবানীর বহি:প্রকাশ করতে পারে, তারা নিজেদের সময়কে ইসলামের তবীগের জন্য উৎসর্গ করুন, লিফলেট বিরতণ করুন, নিজেদের যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন, নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের তবলীগ করুন, নিজের কর্মক্ষেত্রে নিজের চালচলনে এবং আদর্শে লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করুন। সেক্ষেত্রে এই নিরবচ্ছিন্ন আমল পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এটিই একটি কুরবানী"

“প্রত্যেক মুসলমানের ওপর কুরবানী ওয়াজেব নয়, শুধুমাত্র যাদের সামর্থ রয়েছে তাদের ওপরই ওয়াজেব কিন্তু তাক্‌ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং খোদা তা’লার জন্য নিজের দায়িত্বাবলী পালন করা এবং বিধি নিষেধের ওপর আমল করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ বা আবশ্যকীয়। হোক সে গরীব বা ধনী, পুরুষ হোক বা মহিলা অথবা যুবক হোক বা বৃদ্ধ, নামায প্রত্যেকেরই জন্য ফরজ”

গরীবের সেবা হয়, অধিকার আদায় করা হয়, ভাইদের দেখে উত্তম আচরণ করা হয়, একে অপরকে ক্ষমা করার অভ্যাস হয়, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এ সকল কাজ হয় তাহলে এই সকল অধিকার আদায় ইবাদতে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা’লার দরবারে গৃহীত হয়ে মানুষকে আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্যলাভকারী বানায়।

সুতরাং আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা’লা সকল চাহিদা থেকে মুক্ত, তিনি না খাবার খান না পান করেন। তাঁর কোন মাংসের প্রয়োজন নেই আর না তাঁর লক্ষ লক্ষ পশুর রক্ত প্রবাহের কোন প্রয়োজন আছে আর না এর দ্বারা তাঁর কোন উপকার সাধন হয় আর এই রক্ত ঝরানো খোদা তা’লার নামে কোন মানুষকেই উপকৃত করতে পারে না। তিনি বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করে এটি বলেন যে, চিরস্থায়ী পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য, নিজেদের ঈদকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে জানার অনুভূতি সৃষ্টি কর, আর একারণে কতক বাহ্যিক কুরবানীও রেখেছেন এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার দিকেও দৃষ্টি দাও। কুরআন করীমে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী নিজ সত্ত্বাকে খোদা তা’লার সম্মুখে উপস্থাপন কর। নিজেদের আমলসমূহকে খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাও।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন– প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম এমনই যে, এসবকিছু পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর লাভ হয়ে থাকে এবং ভয়-ভীতি, ভালবাসা ও সম্মানের মূল হল পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান। অতএব যাকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর যাকে ভয় ভীতি ও ভালবাসা পুরোপুরি দেওয়া হয়েছে তাকে প্রত্যেক সেই গুনাহ থেকে যা ঔদ্ধত্য থেকে সৃষ্টি হয়, এথেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

অতএব এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা কর। এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা’লার ভয়ভীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কেননা এই বিষয়গুলোই ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা করে। মানুষ না জেনে না বুঝে অনেক গুনাহ করছে। আর এটি তার হৃদয়ে স্মরণ হয় না যে খোদা তা’লা প্রতিমুহূর্ত আমাকে দেখছেন। তিনি বলেন–অতএব আমরা এই মুক্তির জন্য অর্থাৎ যা তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আর যা ঔদ্ধত্য থেকে মুক্তি দেয়, তার মুক্তির জন্য না কোন রক্তের মুখাপেক্ষী আর না কোন ক্রুশের মুখাপেক্ষী, আর না ক্রুশের প্রয়োজন আর না কোন প্রায়শ্চিত্যের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। বরং আমরা

শুধুমাত্র একটি কুরবানীর মুখাপেক্ষী যা আমাদের নফসের কুরবানী যার প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের সত্ত্বা অনুভব করছে। এরূপ কুরবানীর নামই হল ইসলাম।

‘ইসলাম’ অর্থ হল “জবাই হওয়ার জন্য নিজের অন্তরের খুশি এবং সন্তুষ্টির সাথে নিজ সত্ত্বাকে উপস্থাপন করা যা পরিপূর্ণ প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসাকে চায়। আর পরিপূর্ণ ভালবাসাও পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান চেয়ে থাকে। অতএব ইসলাম শব্দটি এই কথার দিকেই ইঙ্গিত করে যে, প্রকৃত কুরবানীর জন্য পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও পরিপূর্ণ ভালবাসার প্রয়োজন, এছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এরই দিকে আল্লাহ্ তা’লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত প্রদান করে বলেন–*“লাইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালিকাইয়্যানালুহুত তাক্‌ওয়া মিনকুম।”* অর্থাৎ তোমাদের কুরবানীর মাংস ও রক্ত আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না বরং শুধুমাত্র এই কুরবানীই আমার কাছে পৌঁছায় যে তোমরা আমাকে ভয় করো এবং আমার জন্য তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীরাও নিজেদের মাঝে এই তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করেছিলেন যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) করছেন। যার কারণে তাঁরা “সামেয়ানা ও আতা’না” (শুনলাম এবং মানলাম) এর পরিপূর্ণ আদর্শ দেখিয়েছিল। পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান

“নিয়্যত যদি তাক্‌ওয়ার ওপর চলা এবং খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং আল্লাহ্ তা’লার বিধি নিষেধের ওপর আমল করার চেষ্টা প্রচেষ্টা হয় তাহলে এই কুরবানী গ্রহণীয় হবে।”

তাঁরা লাভ করেছিলেন, ফলশ্রুতিতে তাঁরা পরিপূর্ণ ভালবাসার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসার কারণেই তাঁরা মদের নেশার ওপরও বিজয় লাভ করেছে। আর এই ভালবাসা মদের নেশার ওপর জয় লাভ করেছে এবং তারা প্রথমেই মদের মটকা বা কলস ভেঙ্গেছে পরবর্তীতে তাঁরা খবর নিয়েছে যে, এই আদেশ তাদের জন্য, নাকি অন্যদের জন্য। আর এই আদেশের সত্যতা বা বাস্তবতাই বা কি?

অতএব এই রূহকে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন আর যখন এই রূহ সৃষ্টি হবে তখন এই কুরবানীর মেরাজে বাহক হয়ে খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী বানিয়ে দিবে। কুরবানী ঈদের রূহ পুনরায় হৃদয়ে দৃশ্যমান হবে এবং আল্লাহ্ তা’লার প্রিয়ভাজন করবে।

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, এই মর্যাদা সব সময় এই বিষয়কে সামনে রাখা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয় যে, খোদা তা’লা আমার সকল কথা ও কর্ম দেখছেন, প্রত্যেক কাজ যদি এই চিন্তাভাবনায় করা হয় আর তা আল্লাহ্ তা’লার খাতিরে হয়, আল্লাহ্ তা’লার ভয় থাকে যে, তিনি আমার প্রত্যেক কাজ দেখছেন, তাহলে প্রত্যেক দিনই কুরবানীর সওয়াবে ভূষিতকারী।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় যে, আমরা যেন খোদা তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা’লার ভয়-ভীতি ও ভালবাসার জ্ঞান অন্বেষণ করি। সেই প্রকৃত ঈদ উদযাপনের চেষ্টা করুন যা জান, মাল, সময়, এবং মান-সম্ভ্রমকে কুরবান করার অঙ্গীকারের যথার্থতা আমাদের ওপর সুস্পষ্ট হয়। আমাদের প্রতিটি ঈদই যেন আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়।

যদি চিন্তাভাবনা এমনই হয়, তাহলে এই ঈদ বছর শেষে আসবে না, শুধুমাত্র পশুদের গলায় ছুরি চালানোর খুশি প্রকাশের জন্য হবে না, শুধু এই কথা প্রকাশের জন্য হবে না যে, আমার পশু থেকে এত কিলো মাংস হয়েছে বরং সেটিই প্রকৃত ঈদ হবে যা এই সমস্ত বাহ্যিক প্রকাশের চেয়ে উর্ধ্বে। সেই ঈদ হবে যা প্রতিদিন আসবে আর প্রতিটি দিন যা উদিত হয় ইনশাআল্লাহ্ তা’লা তা খোদা তা’লার সন্তুষ্টি নিয়েই উদিত হবে।

আল্লাহ্ তা’লা এমনটিই করুন যেন আমরা এই প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হই এবং আমরা যেন বারবার আল্লাহ্ তা’লার পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি। আর এই সমস্ত পুরস্কার শুধু আমাদের মধ্যেই যেন শেষ না হয়ে যায় বরং আমাদের বংশধররা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী হয়। তাঁর অনুগ্রহকে অর্জনকারী হয়। আল্লাহ্ তা’লার রহমত ও বরকতকে অর্জনকারী হউক, আল্লাহ্ তা’লার পুরস্কারের অংশীদারী হতে থাকুক। খোদা তা’লা করুন, এমনটিই যেন হয়।

এখন খুতবা সানীয়ার পর দোয়া হবে। দোয়াতে সেই সকল শহীদদের পদমর্যাদা উন্নতির জন্যও দোয়া করুন, তাদের জন্য এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তান ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দী আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা’লা দ্রুত তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন। যারা আর্থিক কুরবানী করে থাকে তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা’লা যেন তাদের প্রতিদান দেন, তাদের ধনসম্পদ ও ব্যক্তিবর্গকে বরকত দান করেন। যে যেভাবেই কুরবানী করুক না কেন, আল্লাহ্ তা’লা তাদের সকলের কুরবানী কবুল করুন।

পৃথিবীতে যে সকল ওয়াকফে জিন্দেগী রয়েছে বিশেষভাবে সে সকল এলাকায় যেখানে বিরোধিতার ঝড় বয়ে চলছে, সেখানে তারা অবিচল রয়েছে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে, তাদের জন্য দোয়া করুন। শুধু পাকিস্তানই নয়, পৃথিবীর আরোও দেশ রয়েছে, যেখানে বিরোধিতা চলছে। পাকিস্তানের জামা’তের জন্য অনেক দোয়া করুন। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি বেশ কয়েক বার উল্লেখ করেছি, মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে কিন্তু কোন এক পর্যায়ে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্ তা’লার পাকড়াও করার উকরণও রেখেছেন, আল্লাহ্ তা’লা অতি দ্রুত সেই উপকরণ সৃষ্টি করুন।

ইন্দোনেশিয়ার কতক স্থানে অনেক বেশি বিরোধিতা হচ্ছে। কতক লোক আহমদীয়াতের কারণে দীর্ঘ সময় থেকে গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা’লা তাদের প্রশান্তির উকরণ সৃষ্টি করুন। প্রত্যেক সেই স্থান যেখানে জামা’তের বিরোধিতা হচ্ছে, সেখানের আহমদীরা অস্থির রয়েছে বা চিন্তিত রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা’লা তাদের প্রত্যেকের অস্থিরতাকে দূরীভূত করেন। সেই সাথে আপনাদের সকলকে এবং এমটিএ-এর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল আহমদীদেরকেও ঈদ মুবারক। আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত এই ঈদ আমাদের জন্য অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণের উপায় উপকরণ নিয়ে আসুক। আমীন।

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মরুব্বী সিলসিলাহ

জুমুআর খুতবা

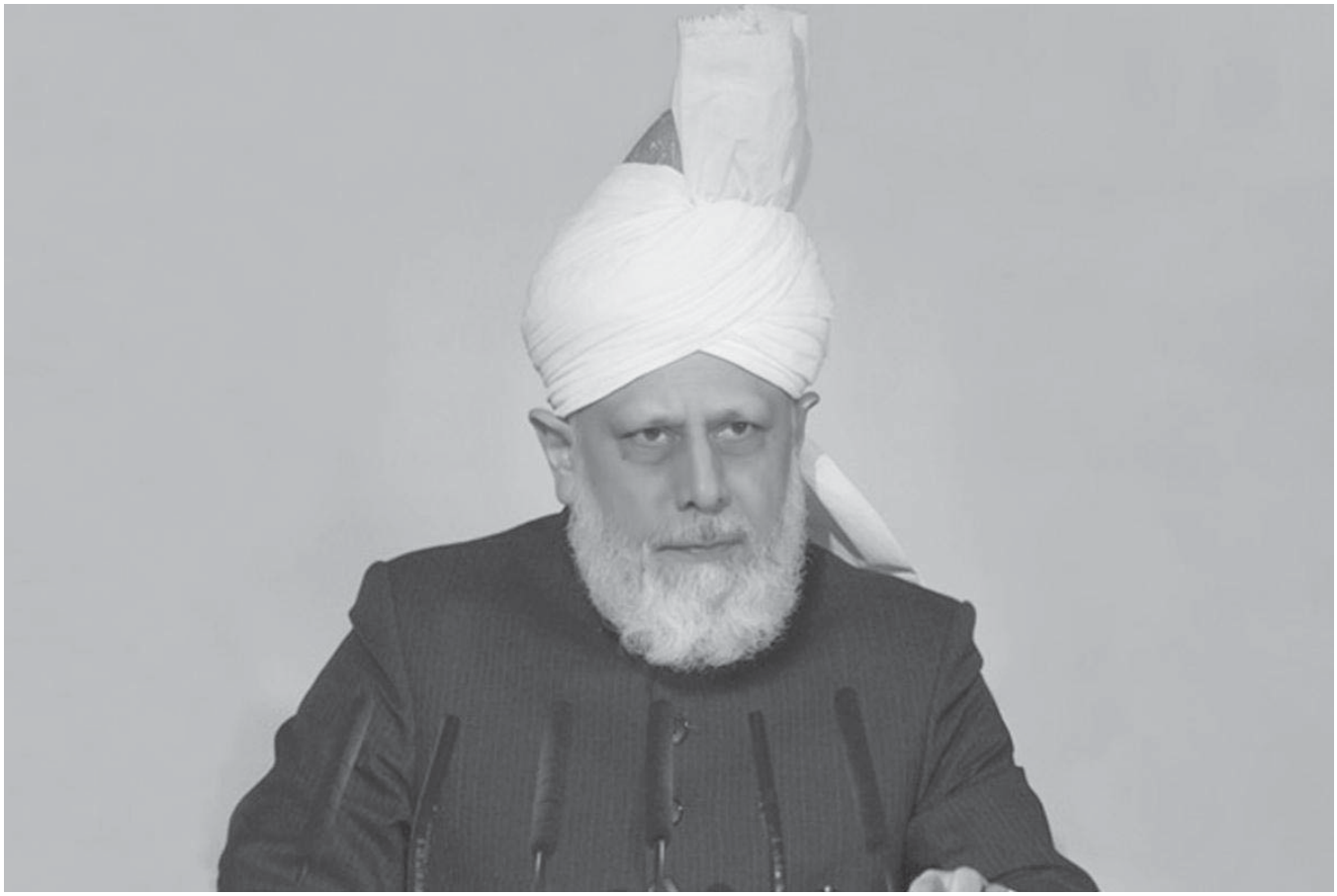

“খোদা তা’লার ওপর ঈমান রাখা দাবী করে, নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করার পরও স্বয়ং দূর্বলদের অধিকার প্রদান না করা আর সমাজের শান্তি বিনষ্ট করা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।”

“সর্বদা এতীমদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখো আর বিশেষভাবে ধর্মের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের প্রতি যথেষ্টই খেয়াল রাখা উচিৎ।”

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৬ নভেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ
تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ
لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۱﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২২১)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ
مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۴۱﴾

(সূরা আল্ বাকারা:২৪১)

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ
قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿۲۲۹﴾ ع ۲۸ ۱۲

(সূরা আল্ বাকারা:২২৯)

এসব আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অধিকার প্রদানের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাতে এ শ্রেণীর মাঝে এ চেতনা জন্ম না নেয় যে, আমাদের খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ নেই। সমাজে আমাদের কোন মূল্য নেই, শক্তি ও ক্ষমতাধররা যেভাবে ইচ্ছে আমাদের সাথে ব্যবহার করবে। প্রত্যেক আয়াতের শেষাংশে 'আযীয' ও 'হাকীম' শব্দ ব্যবহার করে সেসব দুর্বল শ্রেণীর মাঝেও এ চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি ক্ষমতাধরেরা তোমাদের প্রতি অন্যায় করে আর তোমাদের অধিকার প্রদান না করে তাহলে তাদের ওপর এ মহা পরাক্রমশালী খোদা আছেন, যিনি অন্যায়কারীদের ধৃত করেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা যারা আমার এ প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশাবলীর ওপর সঠিকভাবে আমল করে না, আমি সব শক্তির উৎস; তাদেরকে ধৃত করবো। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মান্যকারীদের মনযোগও আকর্ষণ করেছে, এটি অধিকার এমন নয় যে, যদি তোমরা প্রদান না করে বরং অন্যায় করো তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই। বলা হয়েছে, সর্বদা একজন মুসলমান ও একজন মু'মিনকে মনে রাখতে হবে, এসব বিষয়ের ওপর আমল করা একান্ত আবশ্যক, কেননা এটিই সমাজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। এর ওপর আমল না করে বিত্তবানরা সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিতকারী আর খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের দাবী করে, নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করার পরও দুর্বলদের অধিকার প্রদান না করা, সামজের শান্তি বিনষ্ট করা সমিচিন নয়।

দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মনযোগ না দিলে তাদের মধ্যে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হবে আবার অনেক সময় ভয়ানক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তো তারা এসব প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী, যাদের ওপর এ অধিকার প্রদান আর পরিবেশকে সুন্দর করার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে নি। সুতরাং এ দায়িত্ব না পালন করার জন্য, এরা যারা দায়িত্ব পালন করে না, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বলেন, হে যারা অধিকার প্রদান করছ না, অথবা অন্যায়ভাবে অধিকার হরণ করছ! সর্বদা মনে রাখবে, তোমাদের ওপর একজন শক্তিশালী ও পরাক্রমের অধিকারী খোদা আছেন আর তাঁর নির্দেশের ওপর আমল না করে, সে নির্দেশ যা প্রজ্ঞায় পূর্ণ এর ওপর অনুশীলন না করে তোমরা শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রেমময় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হচ্ছ। আর এটি সে পরাক্রমশালী খোদার কাছে কোনভাবেই গ্রহণীয় নয়। তাই মনযোগ দাও, প্রজ্ঞা অবলম্বন করো, অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দাও যাতে সে পরাক্রমশালী খোদা যিনি পরাক্রমশালী ও দয়ালু তোমাদের প্রতি দয়া করে তোমাদের পক্ষে আযীয বৈশিষ্ট্যের বিকাশ দেখান।

"বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত।"

এসব আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি, প্রথম আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে: এবং তারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ। এবং তোমরা যদি মিলেমিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ্ ফ্যাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তোমাদেরকেও কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এ আয়াতে এতিমদের সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে আর এতিমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরও বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা রয়েছে, যাতে তাদের অধিকার প্রদানের আর তাদের জন্য দয়ার হাত প্রসারিত

করার নির্দেশ রয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা তোমাদের ভাই আর ভাইয়ের সাথে একজন আদর্শ ভাই কি ব্যবহার করে। বড় ভাই সর্বদা এ চেষ্টাই করে, আমার ভাই যেন পড়াশুনায় ভাল হয়, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, নৈতিক গুণাবলীও যেন উন্নত হয়, জামা'তের কাজে-কর্মেও আগ্রহ রাখে, সে যেন ভাল বন্ধুদের চলাফেরা করে। যেখানে তার পড়াশুনার প্রতি দৃষ্টি রাখেন সেখানে তার খেলা-ধুলার প্রতিও দৃষ্টি দেন যাতে তার স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। যদি আদরের ভাই অসুস্থ্য হয়ে পড়ে তাহলে চিন্তিত হয়ে যায়। তার সেবাযত্ন আর সুচিকিৎসার প্রতি পুরো দৃষ্টি দেন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের সমাজের এতিমরা তোমাদেরই ভাই। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, তাদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখো, তাদের সংশোধনের বিষয়টিও সর্বদা তোমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে। তাদেরকে সমাজের একটি মূল্যবান অংশ বানাতে হবে। যদি তাদের পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন না থাকে যারা তাদের দেখাশোনা করতে পারে তাহলে এমন যেন না হয় যে, তাদেরকে নষ্ট করে ফেলবে। বলা হয়েছে, এটি একজন মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়। মু'মিন সে, যে এসব এতিমদের প্রতি যত্নবান হয়ে তাদেরকে সমাজের উপকারী সত্বায় উপনীত করার চেষ্টা করে।

ইসলামের যে শিক্ষা, ভালবাস আবার শাসনের সময় শাসনও করো আর সর্বদা সংশোধনের উদ্দেশ্য দৃষ্টিতে রাখো। তোমাদের এতিম ভাই এবং সন্তানদের জন্যও এর প্রতি দৃষ্টি রাখো। যেভাবে তোমরা নিজ সন্তান-সন্ততি ও ছোট ভাইদের জন্য সহানুভূতির প্রেরণা রাখো আর এ প্রেরণা নিয়ে তাদেরকে নষ্ট হবার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো, অন্যায় করলে বাঁধা দাও এবং বুঝাও, ভাল কাজ করার উপদেশ দাও, বেশি বারাবারি করো না যাতে তারা বিদ্রোহী হয়ে না যায় আর এতবশি আহলাদও দাও না যাতে আশকারা পেয়ে মাথায় চড়ে।

এতিমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, সর্বদা তাদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দাও যাতে তারা সমাজের মূল্যবান অংশে পরিণত হতে পারে। আবার বলা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের নিকটাত্মীয় ও স্নেহভাজনদের সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখো সেভাবে দৃষ্টি দিবে। সবসময় মনে রাখবে এরা তোমাদের ভাই। এদের প্রতি দৃষ্টি রাখা তোমাদের দায়িত্ব।

অন্যত্র এতিমদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝

(সূরা আন্ নিসা:১০)

অর্থাৎ, এবং তারা যেন ভয় করে, যদি তারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যেত, তারা আশঙ্কা করত যে, এদের কি হবে; অতএব তারা যেন আল্লাহ্‌র ত্বাকওয়া অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সুস্পষ্ট কথা বলে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে কেউই জানে না, আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত থেকো; কারণ, আল্লাহ্ তা'লা পূণ্যবানদের পুরস্কৃত করেন। তোমরা এতিমদের প্রতি যত্নবান হও যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে সকল প্রকার দু:খ-কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে।

তাই সর্বদা এতিমদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখো, আর বিশেষভাবে যারা ধর্মের খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখা উচিৎ। তাদের সন্তানদের মনে যেন কখনও এ চিন্তা না আসে, আমাদের পিতা ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে গেছেন।

বরং প্রত্যেক শহীদের সন্তান যেন এতে গৌরব করে, আমাদের পিতা ধর্মের খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করে স্থায়ী জীবন লাভ করেছেন আর আমাদের মাথাও গৌরবে উঁচু হয়েছে। সর্বদা এমন বাচ্চারা যেন মনে করে জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে জামা'ত এবং জামা'তের সদস্যরা আমাদেরকে এমনভাবে আপন করে নিয়েছে, আমাদের প্রয়োজন আর আমাদের অধিকারের প্রতি এমনভাবে রেখেছে যেভাবে এক ভাই তার অপর ভাইয়ের জন্য রাখে। যেরূপে একজন পিতা তার সন্তানদের প্রতি রাখে।

সবসময় এরূপ শিশুদের মনে এ চেতনা যেন থাকে যে, আমাদের ভাইয়েরা এবং জামা'ত আমাদের তরবিয়তের দায়িত্ব পালন করেছে। যদি কোন শিশুর পিতা তার জন্য কোন সম্পত্তি রেখে মারা যান তাহলে তার নিকটাত্মীয় ও আশেপাশের মানুষ তার সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি দিয়ে তা গ্রাস করার চেষ্টা করবেন না। বরং নির্দেশ হচ্ছে, সাবধানতার সাথে তা ব্যবহার করো, আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪

(সূরা বনী ইস্রাঈল:৩৫)

এবং তোমরা সে পন্থা ব্যতিরেকে যা সর্বোত্তম, এতিমের ধন-সম্পদের কাছে যেও না যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। এমন যেন না হয় যে, লালন-পালনের উসীলায় তার পুরো সম্পত্তি উজাড় করে ফেল। যদি তোমরা অবস্থাপন্ন হও তাহলে যেখানে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে আহার ও পরিধান করাও সেখানে এর জন্যও খরচ কর। এবং যদি তাদেরকে লালন-পালন করার মত অবস্থা স্বচ্ছল না হয় তাহলে এতিমের পিতা-মাতা যদি কোন সম্পদ ছেড়ে যায় তা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ততটুকুই ব্যয় করো যদ্দারা তার প্রয়োজন পূর্ণ হয়, যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা পূর্ণ হয় আর যখন সে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয় তখন তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দাও।

অনেক সময় দেখা যায়, কতক নিকটাত্মীয়ও এতিমের সম্পদ সে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ফেরত দেয় না। আমরা তার পিছনে খরচ করেছি এ অজুহাতে পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ স্থায়ীভাবে কব্জা করে রাখে। এটি আল্লাহ্ তা'লা খুবই অপছন্দ করেন, এতিমের লালন-পালনের জন্য নিয়্যত পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। যদি নিয়্যতের মধ্যে ক্রুটি থাকে তাহলে বাহ্যত একজন এতিমের প্রতিপালন করে, অন্যদের

"এতীমদেরকে তাদের পিতার সম্পত্তি থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করার হীন চেষ্টা করবে না।"

"এতীমের লালন-পালন, তার ধন-সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ আর তাকে সমাজের একটি মূল্যবান অংশে পরিণত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"

দৃষ্টিতে প্রশংসার যোগ্য হয় যে, সে তার নিকটাত্মীয় বা কোন এতিমের উত্তম প্রতিপালন করেছে বা করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেতো এতিমের সম্পদ দ্বারাই তার লালন-পালন করছে, সবাইতো আর তা জানে না। আর সে অর্থ কেবল তার প্রতিপালনের পিছনেই ব্যয় করছে না বরং নিজেও এথেকে লাভবান হয়। নিজের স্বার্থ উদ্ধারই হয় আসল উদ্দেশ্য।

এতিম বড় হয়ে যখন জানতে পারে যে, তাকে লালন-পালনের নাম করে তার প্রতিপালক সকল সম্পত্তি নষ্ট করেছে, অথবা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাকে দিতে চাচ্ছে না তখন বিশৃংখলা আরম্ভ হয়। ভাই-ভইয়ের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। মামা, চাচা, ভাই ও ভাতিজাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। অসন্তোষ বাড়তে থাকে, একে অপরের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা আরম্ভ করে। জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে হলে বিচার বিভাগে নালিশ দায়ের হয় অথবা বিচার বিভাগের আশ্রয় নেয়। যারা নিজেদের মধ্যেই মিমাংসা বা নিষ্পত্তি চায় তারা অনেক ক্ষেত্রে সংশোধনকল্পে আমাকে লিখেন যে, আমাদের অধিকার পাইয়ে দিন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে পারো না। আল্লাহ্ বিশৃংখলা-পরায়ণদেরকে সংশোধনকারীদের তুলনায় ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'লা জানেন আর তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ।

তিনি মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জানেন যে, এতিমের প্রতিপালন করার অগ্রহের পিছনে উদ্দেশ্য কি। সমাজকে ধোঁকা দেয়া যায়, বিচারালয়ে মামলায় জয়ী হওয়া যায় কিন্তু খোদা তা'লাকে প্রতারিত করা যায় না। আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের কাছে এটি প্রত্যাশা করেন, এতিমের সম্পদ ভক্ষণের তো প্রশ্নই উঠে না, তুমি একজন স্নেহশীল ভাইয়ের মত এতিমের সাথে ব্যবহার করো। কেবল তার প্রতিপালনই নয় বরং যদি সম্ভব হয় তাহলে তাকে তার পায়ে দাঁড়ানোর জন্য যদি সামর্থ থাকে তাহলে নিজের পকেট থেকেও খরচ করো। তাকে কোন কাজে, কোন ব্যবসায় লাগিয়ে দাও, যাতে সে সমাজের মূলবান ও উপকারী অংশ হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়ালাউ শাআল্লাহু লা'নাতাকুম' এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তোমাদেরকেও কষ্টে পতিত করতে পারতেন। তোমাদেরকে এমন নির্দেশ দিতেন যা তোমাদের জন্য কষ্টকর হতো। যদি তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো, কোন এতিমের পিতা সম্পদ রেখে গেছেন তাসত্ত্বেও তোমরা তা খরচ করবে না আর এতিমের সম্পদ পাই পাই করে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এবং লালন-পালনের ব্যয়ও নিজেকেই বহন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে কোন সমস্যা ফেলেন নি এর অর্থ এ নয়, যে বৈধ সুযোগ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ এতিমের সম্পদ থেকে তার লালন-পালনের জন্য খরচ করতে পারো, এথেকে অন্যায়ভাবে লাভবান হবে আর তার সম্পদ দু'হাতে উড়িয়ে দিবে।

সুতরাং সর্বদা মনে রেখ! অবৈধভাবে এতিমের সম্পদ গ্রাস করার ফলে তুমি ধৃত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

(সূরা আন্ নিসা:১১)

নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে।

তাই এতিমের প্রতিপালন, তার সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ, তাকে সমাজের মূল্যবান অংশে পরিণত করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি এমন কোন বিষয় নয় যেক্ষেত্রে মানুষ বলে, এদিকে মনযোগ না দিলেও কিছু এসে যায় না। আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ইন্নাল্লাহা আযিযুন হাকীম' একথা বলে মনযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, এতিম দুর্বল; তার মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই যে, সে তার অধিকার রক্ষা করতে পারে বা অথবা অন্যের থেকে আদায় করতে পারে কিন্তু সমাজকে সর্বদা মনে রাখা দরকার, যাদেরকে এতিমের পরিচর্যাকারী নিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, এতিম শক্তিশালী নয়, পরাক্রমের অধিকারীও নয়, বলবানও নয়, কিন্তু তার ওপর

একজন মহাপরাক্রমশালী খোদা আছেন। তাঁর হাত আছে যিনি তোমাদের সহ পুরো বিশ্বের সব জিনিষের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন, যদি এতিমের অধিকার হরণ করো তাহলে খোদা অবশ্যই তোমাদেরকে ধৃত করবেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী, তিনি প্রজ্ঞার আলোকে যদি তোমাদেরকে এ অবকাশ দেন অর্থাৎ প্রয়োজনানুপাতে যা না হলেই নয় এমন সম্পদ তোমরা এতিমের ধন-সম্পদ থেকে তোমরা খরচ করতে পারো। তোমাদেরকেও সবসময় প্রজ্ঞার আলোকে এ বিষয়টি মনে রাখা প্রয়োজন আর সাময়িক লাভের পরিবর্তে সুদূর প্রসারী কল্যাণকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, যার ফলে সমাজ থেকে নৈরাজ্য দূরীভূত হবে, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হবে আর প্রতিপালক স্বয়ং নিজ উদরে আগুন ভক্ষণ থেকে বিরত রাখবে আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকেও রক্ষা পাবে।

এরপর আমার তেলাওয়াতকৃত দ্বিতীয় আয়াত, এতে সমাজের আরেকটি দুর্বল শ্রেণী অর্থাৎ বিধবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত এমনিতেই সমাজে একজন নারীকে দুর্বল মনে করা হয়। তারপর যদি সে হয় বিধবা তাহলে সমাজের অধিকাংশই তার অধিকারের প্রতি যত্নবান হয় না। বিশেষভাবে কম উন্নত সমাজে এবং এমন সমাজে শিক্ষিত মানুষ যারা আছে তারাও সামাজিক প্রভাবের ফলে অন্যায় করে থাকে। মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে নারীর অধিকার সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, কেননা খোদা তা'লা বারংবার এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করেছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলো আজ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করছে, কিন্তু চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেই পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এসব অধিকার প্রদানের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছে, যদি সে যুগের সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তাহলে আশ্চর্য হতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা কেবল নারীর অধিকারই প্রতিষ্ঠা করেন নি বরং সে সমাজ যেখানে একেবারেই অধিকার প্রদান করা হতো না, সেখানে সাহাবীদের চেহারাও পাল্টে গেছে আর তারা এর ওপর আমল করে দেখিয়েছেন।

পঠিত আরেকটি আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, এবং তোমাদের মধ্যে থেকে যারা মৃত্যু বরণ করে এবং তার স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসীয়্যত করে যাবে যে, তাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কার না করে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দিতে হবে। কিন্তু যদি তারা স্বেচ্ছায় চলে যায় তা হলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বিধবাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তার স্বামীর গৃহে থাকার অধিকার দিয়েছেন। মহিলাদের সম্পর্কে নির্দেশ হচ্ছে, সে তার স্বামীর গৃহে বিধবা বেশে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে, কিন্তু এর পরেও সে চাইলে এক বছর পর্যন্ত থাকতে পারবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর প্রতি বুৎপত্তি রাখতেন আর এথেকে এটি প্রমাণ করতেন যে, ইদ্দতের নির্ধারিত চার মাস দশ দিন সময় ছাড়াও, এক বছর থাকার অনুমতি রয়েছে। এ আয়াতের আলোকে তার মতামত ছিল, নারীকে যতটা সম্ভব সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিৎ। অনেক সময় যদি মৃত ব্যক্তির বাড়ী থাকে, যে বাড়ী উত্তরাধিকার হিসেবে ছেড়ে যায় আর যখন সম্পত্তি বন্টন হয় তখন তা যদি অন্য কারো ভাগে যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তখনও তারা যেন ধৈর্য্য ধারণ করে আর এক বছর পর্যন্ত মহিলা বা বিধবাকে বিরক্ত না করে। কেননা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও একথা লিখেছে এবং আজও এভাবেই ঘটছে, উদাহরণস্বরূপ যদি বিধবার কোন সন্তান না থাকে অথবা কারো দু'জন পত্নী থাকে বা ছিল, প্রথম স্ত্রী'র সন্তান অথবা যদি মহিলার কোন সন্তান না থাকে তাহলে স্বামীর পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যে ঘর ভাগে পেয়েছে, সে বিধবাকে সেখান থেকে বের করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এক বছর পর্যন্ত তার অধিকার আছে তাই কোন উত্তরাধিকারীর এ ব্যাপারে বিধবার ওপর বল প্রয়োগ বা বিরক্ত করার কোন অধিকার নেই, কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় যেতে চায় তাহলে বৈধব্যের মেয়াদ পূর্ণ করে যেতে পারে। এ সিদ্ধান্তের অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছে। মহিলাকে ন্যাসঙ্গত সিদ্ধান্ত করার অধিকার দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ এমন ফয়সালা যা আইন ও শরীয়ত মোতাবেক হবে। তাই সর্বদা মনে রাখতে হবে, এটি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় খোদার নির্দেশ। সবশেষে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা মহিলাদেরকে তাদের দুর্বলতার সুযোগে বাধ্য করো আর যদি তাকে দেখাশোনা করার মত তার কোন নিকটাত্মীয় না থাকে তাহলে তার অপারগতা থেকে অন্য কেউ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'লা ছোট-খাট বিষয় ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে দৃষ্টিপটে রেখে একান্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। মহিলার স্বামীর পক্ষের আত্মীয়-স্বজনকেও সাবধান করেছে, সর্বদা মনে রেখ, খোদার সত্ত্বা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। যদি তার নির্দেশের ওপর আমল না করো তাহলে তাঁর কাছে ধৃত হবে।

এতে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমতঃ উল্লেখ করা হয়েছে, বিধবাকে একবছর পর্যন্ত (স্বামীর) ঘরে থাকতে দাও, দ্বিতীয় অধিকার বিধবাকে দেয়া হয়েছে, যদি সে বিবাহ করে বা অন্য কোন কারণে এক বছরের পূর্বেই ঘর ছাড়ে তাহলে এটি তার ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। আত্মীয়-পরিজনদের এক্ষেত্রে বাঁধা দেয়া উচিৎ নয় যে, তোমাকে অবশ্যই এক বছর এখানে থাকতে হবে। অনেকে কষ্ট দেয়ার জন্যও বলে থাকে। অনেক সময় আত্মীয়-স্বজন চায় বিধবা যেন পুনরায় বিবাহ না করে অথচ বিধবার বিবাহও একটি পূণ্যকর্ম।

এমন বাঁধা সৃষ্টিকারীদের উত্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) 'ওয়াল্লাহু আযিযুন হাকীম'-এর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, ***বিধবার বিবাহ সম্পর্কে অনেকে বলেন, এটি আমাদের সম্মানের পরিপন্থী। বিশেষভাবে আমাদের পাকিস্তান ও ভারতের সমাজে, কতক পরিবারে অনেক বেশি কঠোরতা দেখা যায়,***

বিধবার বিবাহ করা আমাদের সম্মানের পরিপন্থী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার নাম 'আযীয' আর আমিই সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী। আমি বিয়ে করার নির্দেশ দিচ্ছি। এ নির্দেশ যেহেতু প্রজ্ঞার আলোকে তাই যারা এ নির্দেশের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করে তাদের মনে রাখা উচিৎ, আমি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। সকল সম্মান আমার জন্য, তাই আমার নির্দেশ মান্য করো আর মিথ্যা সম্মানের সন্ধান করো না, যাতে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণ লাভকারী হও।

এরপর তৃতীয় আয়াতে নারীর অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবং তালাক প্রাপ্তা নারীর অধিকার সম্পর্কে রয়েছে, যদি তালাক কার্যকর হয় তাহলে মহিলার জন্য নির্ধারিত যে ইদ্দতের সময়সীমা রয়েছে এরপরে বিবাহ করার বেলায় সে স্বাধীন। অন্যত্র নির্দেশ আছে, তোমরা তাদের বিয়ের বেলায় বাঁধ সেধ না। বরং বিয়েতে সাহায্য করো, কেননা এখন সে নিজের ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছে তাই যদি সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু নারীকে নির্দেশ দিয়েছে, তালাকের পর যদি বুঝতে পারো তুমি গর্ভবতী তাহলে তোমার স্বামীকে জানাও, লুকানো উচিৎ নয়।

বিয়ের পর যদি কোন কারণে বনিবনা না হয় তাহলে এর অর্থ এমন নয় যে, প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করবে আর এ সন্তানের যিনি পিতা তাকে জানাবে না যে, তোমার সন্তান ভুমিষ্ট হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার বলার ফলে তার হৃদয় নরম হতে পারে আর সে তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হয়। বলা হয়েছে, স্বামীর অধিকার বেশি সে তাকে ফিরিয়ে এনে পুণরায় ঘর বাঁধে এবং মান-অভিমান দূর হয়। অন্যদিকে আত্মীয়-স্বজনকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এক্ষেত্রে তারা যেন কোন বাঁধার সৃষ্টি না করে। অনেক সময় নিকটাত্মীয়রাও মেয়েকে নষ্ট করে থাকে, যদি সে চুপ করেও বরং ফিরে যেতে সম্মতও থাকে তারপরও নিকটাত্মীয়রা হট্টগোল বাঁধায় যে, এবার তালাক হয়েছে এখন আমরা আর মেয়েকে সেখানে পাঠাবো না।

আমিত্ব এবং সম্মানের প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেক কেস আমার কাছেও আসে। আশ্চর্য হতে হয় যখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মিথ্যা আত্মাভিমানের নামে নিজ সন্তানদের ঘর উজার করে। অনেক মেয়ে চিঠি লিখে, আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয় একত্রে বসবাস করতে চাই কিন্তু উভয় পক্ষের পিতা-মাতার আমিত্ব এ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবার পথে আত্মীয়-স্বজনের কোন বাঁধা সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। যদি পুরুষ তার ভুল বুঝতে পারে তাহলে

"পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে জামা'তের সদস্যদের কাছে বিশেষ দোয়ার তাহরীক"

মিথ্যা আত্মম্ভরিতার নামে মেয়ের সংসার ভাঙ্গা উচিৎ নয়। তারপর আল্লাহ্ তা'লা নারীর অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে বলেন, ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষের ওপর নারীর ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা পুরুষের রয়েছে মহিলার ওপর।

আমি পাঠ যে আয়াত করেছি তার অনুবাদও পড়ে দিচ্ছি, 'এবং তালাকপ্রাপ্তা রমনীরা নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবে, এবং যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাহলে তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ্ তাদের গর্ভাশয়ে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য বৈধ হবে না, এবং তাদের স্বামীরা এ সময়ের মধ্যে তাদেরকে গ্রহণ করার সমধিক হকদার হবে যদি তারা আপোষ-মীমাংসা করতে চায়। এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য আছে যেরূপে কতক অধিকার পুরুষদের ওপর আছে; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষদের এক প্রকার প্রাধান্য আছে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

তাই মানুষ হবার কারণে আর এমন সম্পর্ক যা একটি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, তা পুরুষদেরকেও নির্দেশ দেয় যে, নারীর অধিকার প্রদান করো, নারীকেও পুরুষের

হক প্রদানের নির্দেশ দেয়। আর যখন একে অপরের অধিকারের দিকে দৃষ্টি রাখবে তখন সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। সুতরাং এটি নারীর অধিকার সংরক্ষণের নির্দেশ। ইসলামের এমনই খুব সুন্দর নির্দেশাবলী ছিল যা সমাজের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। ইসলামের পূর্বে আরবরা নারীকে সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল বরং কোন ধর্মই এমনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নি যেভাবে ইসলাম করেছে। মহানবী (সা.) অগনিত স্থানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, 'খাইরুকুম খাইরুকুম লি আহ্‌লিহী ওয়া আনা খাইরুকুম লি আহ্‌লী' {সুনান তিরমিযী বাবু ফযলে আযওয়াজিন্ নবী (সা.)}অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে থেকে খোদার দৃষ্টিতে সেই উত্তম যে তার স্ত্রী'র সাথে সদ্ব্যবহার করে আর আমি তোমাদের মধ্যে থেকে নিজ স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারকারী।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا
شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

(সূরা আন্ নিসা:২০)

এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো; যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো তাহলে স্মরণ রেখ এমনও হতে পারে, তোমরা যে বস্তুকে অপছন্দ করো আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন। তাই পুরুষদেরকেও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা উচিৎ নয়, বরং তার মস্তিষ্কে এ কথা থাকা উচিৎ, আল্লাহ্ এর ওপরও ক্ষমতা রাখেন চাইলে পরিনাম উত্তম করতে পারেন। প্রতিনিয়ত তালাক দেয়া হয় তাই

“সংশোধনকারীদের তুলনায় বিশৃংখলাপরায়ণদেরকে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা’লা জানেন আর তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। তিনি মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জানেন যে, এতিমের প্রতিপালন করার আগ্রহের পিছনে উদ্দেশ্য কি। সমাজকে ধোঁকা দেয়া যায়, বিচারালয়ে মামলায় জয়ীও হওয়া যায় কিন্তু খোদা তা’লাকে প্রতারিত করা যায় না।”

পুরুষদেরকেও চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে-শুনে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ। এবং এ বিষয়টিও দৃষ্টিপটে রাখা দরকার, অনেক ছোট-খাট ব্যাপারে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়। হতে পারে তোমরা এ বিষয়টি অপছন্দ করো কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রেখেছেন।

যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য আর দোয়ার মাধ্যমে নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা’লা এতে বরকত দেন। যে ঘর ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, ভেঙ্গে যাবার উপক্রম, যদি তাদের সন্তানাদি থাকে তাহলে বাচ্চারা ঘরে ভীত-ত্রস্ত থাকে, সেই গৃহই পরিশেষে আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের জন্য শান্তিপূর্ণ ও প্রেম-ভালবাসা ভরা সংসারে রূপান্তরিত হয়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’লা পুরুষ-মহিলা উভয়কে একটি উপদেশ দিয়েছেন, যদিও অধিকারের দিক থেকে তোমরা সমান কিন্তু পুরুষকে ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন বৃত্তির কারণে, কতক দায়িত্বের কারণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে পুরুষদের ছাড় (Margin) দেয়া উচিৎ। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে যদি প্রকৃতিগত কারণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তাই এ দায়িত্বাবলী বুঝা ও পালন করা তোমাদের কাজ। গৃহের ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সরবরাহ করা তোমার দায়িত্ব। এমন যেন না হয় নিজে ঘরে বসে থেকে স্ত্রীকে বলবে যাও বাইরে গিয়ে উপার্জন করো। এখানে পাশ্চাত্যের সমাজে বিভিন্ন গৃহে এমন ঘটনাও ঘটছে। বলা হয় স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষনের দায়িত্ব পালন করা তোমার কাজ।

সুতরাং আল্লাহ্ তা’লা যিনি মহাপরাক্রমশালী ও পজ্ঞাময়, নারী ও পুরুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। আর পরিশেষে মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় বাক্য ব্যবহার করে এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করেছেন, নারীর ওপর তোমাদেরকে যে প্রাধান্য দিয়েছেন এথেকে অন্যায়ভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করবে না, কেননা প্রবল পরাক্রমশালী খোদা তোমাদের উপরে রয়েছেন। তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ দেখছেন। তাঁরই রাজত্ব, তোমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। তোমরা পরিবারের সাথে অসদ্ব্যবহার করলে তাঁর হাতে ধৃত হবে।

সুতরাং তোমাদের ক্ষমতা, প্রাধান্য মহিলাদের ওপর ততটা প্রয়োগ করো যতটা করার অনুমতি আছে আর নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতিও দৃষ্টি দাও। যদি এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখো তাহলে সে প্রজ্ঞাশীল খোদার প্রজ্ঞা থেকেও লাভবান হবে, যিনি তোমাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সুতরাং এগুলো মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় খোদা তা’লার নির্দেশ যদ্দারা সমাজের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। গৃহে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্যের বিস্তার ঘটে। এ প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু যদি এসব বিষয়ের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করা না হয় তাহলে যেখানে সমাজের শান্তি বিনষ্ট হবে সেখানে এমন মানুষ পরিশেষে প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় খোদার হাতেও ধৃত হবে। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সবাইকে এ প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাকে বোঝার তৌফিক দিন।

সানী খুতবার সময় হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি একিট দোয়ার আবেদন করতে চাচ্ছি। বর্তমানে পাকিস্তানের যে অবস্থা তা সবাই অবহিত আছে। সরকার, রাজনীতিবিদ আর ইসলামের নামধারী নেতারা প্রত্যেকে মিলে দেশকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশকে আল্লাহ্ তা’লা রক্ষা করুন। এর পিছনে জামা’তে আহমদীয়ারও অনেক কুরবানী আছে। এজন্য অনেক প্রাণ হারাতে হয়েছে। তাই একটি দেশের প্রতি বালবাসার দাবী হচ্ছে, নির্দেশ হচ্ছে, এর দোয়া পাবার অধিকার রয়েছে।

অনেক পাকিস্তানী যারা দেশের বাইরে বিদেশে বসবাস করেন, যদিও খবর শুনেন এবং দেখেন কিন্তু ধারণা করতে পারছে না যে, বর্তমানে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। মনে হয় যেন এরা দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টায় মেতেছে।

আল্লাহ্ তা’লা এদেরকে কান্ডজ্ঞান দিন আর যদি বিবেক খাটানোর ভাগ্য এদের না হয় তাহলে এমন ব্যাবস্থা করুন যাতে এমন মানুষ নেতৃত্বে আসে যারা দেশ ও দশের প্রতি সহানুভূতি রাখে।

আমরা এখানে বসে দোয়া করতে পারি। আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে তৌফিক দিন, এজন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

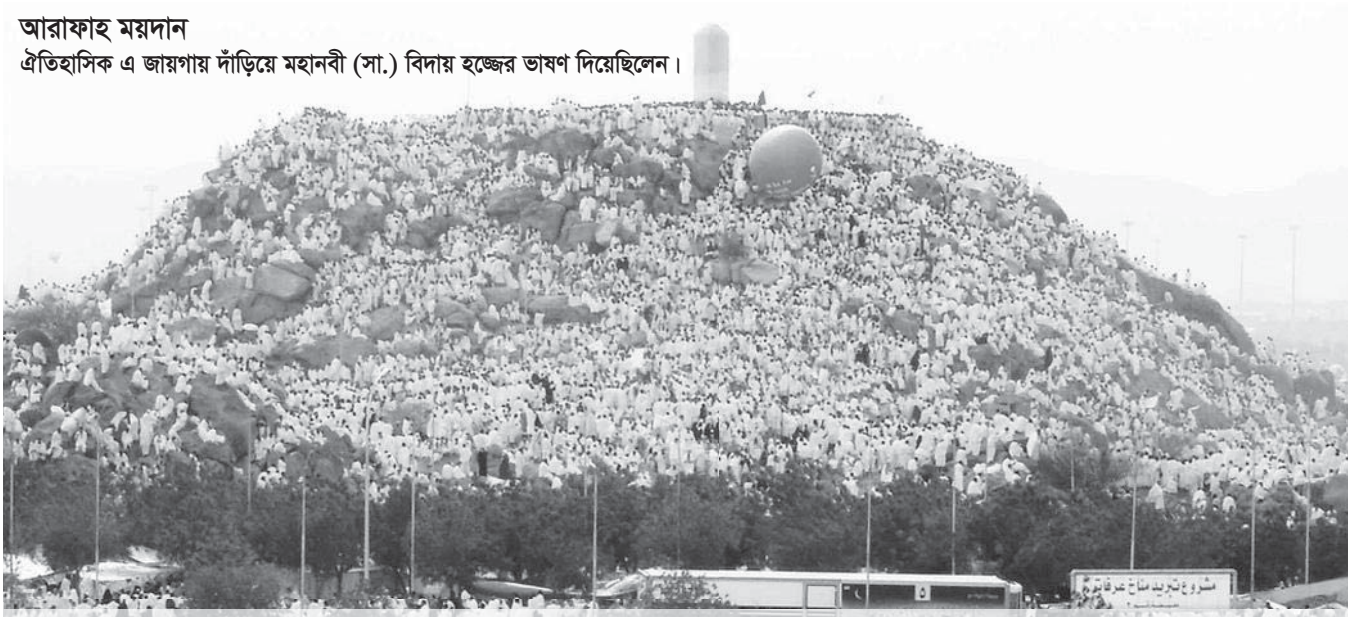

আরাফাহ ময়দান
ঐতিহাসিক এ জায়গায় দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন।

বিদায় হজ্জ এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভাষণ

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

হিজরী নবম বর্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো তা'লা আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলেন। সেদিন তাঁর ওপরে কুরআন করীমের যে প্রসিদ্ধ আয়াতটি নাযিল হয়, তা হচ্ছে- "আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি, ওয়া রাযিতু লাকুমল ইসলামা দিনা" অর্থাৎ 'আমি আজ তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিলাম: এবং যে-সব আধ্যাত্মিক পুরস্কার খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের জন্য অবতীর্ণ হতে পারে, তা সমস্তই তোমার উম্মতের জন্য দান করলাম। তাছাড়া এটাও ফয়সালা করে দেওয়া হলো যে, তোমাদের ধর্ম শুধু মাত্র আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের ওপরে স্থাপিত' (সূরা মায়েদা: ৪)। এই আয়াত তিনি (সা.) মুজদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত লোকের সামনে উচ্চ:স্বরে পাঠ করে শোনান। মুজদালেফা থেকে ফেরার পরে হজ্জের রীতি অনুযায়ী তিনি মদীনাতে থামেন এবং ১১ই যিলহজ্জ তারিখে তিনি (সা.) সমবেত সমস্ত মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দান করেন। এই ভাষণে তিনি (সা.) বলেন:

'হে লোক সকল! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা, আমি জানি না যে, এই বৎসরের পর আর কখনও আমি এই ময়দানে তোমাদের সাথে দাঁড়িয়ে আর কোনও বক্তৃতা দিতে পারবো কি-না।

'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ একে অপরের হামলা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র ও নিরাপদ করে দিয়েছেন।'

'আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ ধরনের কোন ওসীয়্যত বৈধ হবে না, যা কোন বৈধ উত্তরাধিকারীর ক্ষতির কারণ হয়।'

'যার ঘরে যে সন্তান পয়দা হবে, সে তারই সন্তান হবে। এবং কেউ যদি এই সন্তানের পিতৃত্বের ওপরে দাবী উত্থাপন করে, তাহলে সে শরীয়ত মোতাবেক প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে।'

'যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবী করবে, কিংবা কাউকে নিজের মালিক বলে মিথ্যা দাবী করবে, তার উপরে খোদার এবং ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।'

'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপরে তোমাদের যেমন হক্ (অধিকার) আছে, তেমনি তোমাদের ওপরেও তোমাদের স্ত্রীদের হক্ (অধিকার) আছে। তাদের ওপরে তোমাদের অধিকার হচ্ছে যে, তারা সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপন করবে। এবং তারা এমন অশালীন কিছু করবে না, যাতে মানুষের সামনে তাদের স্বামীদের কোনও সম্মানহানি ঘটে। এ জাতীয় কিছু যদি তারা করে, তাহলে তোমরা (কুরআন করীমের নির্দেশ অনুযায়ী তা যাচাই করবে এবং আদালতের ফয়সালা মোতাবেক) তাদেরকে শাস্তি দিবে, কিন্তু তাতে কোন বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু, যদি তারা এমন কিছু না করে, যা তাদের স্বামী ও বংশের জন্য অবমাননার কারণ হয়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হবে, তোমাদের সাধ্যমত তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করা। মনে রাখবে যে, সর্বদাই নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা, খোদা তা'লা তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব তোমাদের ওপরে ন্যস্ত করেছেন। নারীরা দুর্বল, তারা তাদের অধিকার নিজেরা রাক্ষা করতে পারে না। কাজেই, তোমরা যখন তাদেরকে বিবাহ করো, তখন খোদা তা'লা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তোমাদেরকে জামিন নিযুক্ত করে দেন। খোদা তা'লার আইন মোতাবেক তোমরা তাদেরকে তোমাদের ঘরে নিয়ে আস। অতএব, খোদা তা'লার অর্পিত সেই জামানতের কখনই খেয়ানত করবে না। এবং স্ত্রীদের অধিকার রক্ষার প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।'

'হে লোক সকল! তোমাদের হাতে এখনও

“প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ, তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে ধর্মেরই হোক, মানুষ হওয়ার কারণে, পরস্পর সমান।”

কিছু যুদ্ধবন্দী রয়ে গেছে। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা তাদেরকে তা-ই খাওয়াবে, যা তোমরা নিজেরা খাও। এবং তাদেরকে তা-ই পড়তে দিবে, যা তোমরা নিজেরা পড়। যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে ফেলে, যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে অন্যের কাছে দিয়ে দিবে। কেননা, তারা খোদারই বান্দা। তাই, কোনও অবস্থাতেই তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেওয়া বৈধ হবে না।

‘হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা শোন এবং ভালভাবে মনে রেখো।

‘প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ, তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে ধর্মেরই হোক, মানুষ হওয়ার কারণে, পরস্পর সমান। –(এই কথা বলার সময় তিনি (সা.) তাঁর উভয় হাত উপরে তুললেন এবং এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির সঙ্গে মিলালেন এবং বললেন) যেভাবে দুই হাতের আঙ্গুলগুলি পরস্পর সমান, সে ভাবেই সকল মানুষ পরস্পর সমান।

‘তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, তোমরা একে অন্যের ওপরে কোন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কর। তোমরা পরস্পর ভাই।’

তিনি (সা.) আবার বলেন : ‘তোমরা কি জান, এখন কোন্ মাস? এই এলাকা কোন এলাকা? তোমাদের কি জানা আছে, আজকের দিন কোন্ দিন?’

লোকেরা উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ, এই মাস পবিত্র মাস। এই এলাকা পবিত্র এলাকা। আজকের দিন হজ্বের দিন।’

তাদের সকলেরই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতে থাকলেন, ‘যেভাবে এই মাস পবিত্র মাস, যেভাবে এই এলাকা পবিত্র এলাকা, যেভাবে এই দিন পবিত্র দিন, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা’লা প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও সম্মান পবিত্র করে দিয়েছেন। এবং কারো জানের ওপরে কিংবা মাল ও সম্মানের ওপরে হামলা করা ঠিক তেমনি অবৈধ যেমন অবৈধ, এই মাসের এই এলাকায় এই দিনের অমর্যাদা করা। এই হুকুম শুধু আজকের জন্যই নয়, শুধু কালকের জন্যই নয়, বরং সেই দিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য, যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে’।

তিনি (সা.) আরও বললেন, ‘এই সমস্ত কথা, যা আমি আজ তোমাদেরকে বলছি, তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও। কেননা, এমনও হতে পারে যে, যারা আজ আমার কথা আমার কাছ থেকে শুনছে, তাদের চাইতে যারা আমার কাছ থেকে আমার এই কথা শুনছে না, তারা এই সকল কথার ওপরে বেশি আমল করবে, বেশি বেশি পালন করবে।’

এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ বলে দিচ্ছে যে, মানুষের মঙ্গল এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রাসূলে করীম (সা.) কত বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। এবং নারীজাতি ও দুর্বলের অধিকার রক্ষার প্রতি কত বেশি আন্তারিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানতেন যে, তাঁর ইহজীবনের দিন শেষ হয়ে আসছে। হয়তো বা আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই, তিনি চান নি যে, যে নারীদেরকে মানব জন্মের আদি থেকেই পুরুষদের দাসী বানিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ-নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই তিনি জগৎ ছেড়ে চলে যান। তিনি চেয়েছিলেন যে, ঐ সকল যুদ্ধবন্দী, যাদেরকে মানুষেরা ক্রীতদাস বলে আখ্যায়িত করে, এবং যাদের ওপরে নানা প্রকার অত্যাচার চালাতে থাকে, তাদের অধিকার সুরক্ষিত করার পরই তিনি যেন দুনিয়া চেড়ে চলে যান। তিনি চান নি যে, মানুষে মানুষে যে প্রকাশ্য প্রার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কাউকে পাতালে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ঘুচিয়ে দেওয়ার আগে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তিনি চান নি, যে সকল কারণে, জাতিতে, জাতিতে দেশে দেশে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়, তা সর্ব-সাকল্যে দূরীভূত করার আগে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। একে অপরের হক্ আত্মসাৎ করা বা অধিকার খর্ব করা সব সময়েই বর্বর যুগের এক অভিশাপ বলে গণ্য করা হয়। তার অশুভ বাসনাকে যতক্ষণ না হত্যা করা হয়, ততক্ষণ তিনি পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের জান ও মালকে সেই পবিত্রতা, সেই নিরাপত্তা, দান না করা হয়, যা খোদা তা’লার পবিত্র মাসগুলোকে খোদা তা’লার পবিত্র ও কল্যানমন্ডিত স্থানসমূহকে দান করা হয়েছে, ততক্ষণ তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান নি।

নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দান, সব জাতির জন্য নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপনকরণ, মানবজাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠাকরণ, ইত্যাদির জন্য এত বেশি গভীর উদ্বেগ ও আন্তরিকতা পৃথিবীর আর কোনও মানুষের মাঝে কেউ কি কখনও দেখেছে? হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানবজাতির জন্য এত ভালবাসা, এত আকুলতা, এত সংকল্প আর কোন মানুষের মধ্যে কি কখনও দেখা গেছে? এসব কারণেই তো ইসলামের মধ্যে নারীরা তাদের সম্পত্তির মালিক। যে মালিকানা অর্জন করতে পেরেছে ইউরোপ ইসলামের তেরশ’ বছর পরে। এর কারণেই তো ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সবার সমান হয়ে যায়, তা স যত ছোট এবং যত নীচ জাতের লোকই হোক না কেন।

স্বাধীনতা ও সাম্যের শিক্ষা ও আদর্শ কেবল ইসলাম, হ্যাঁ, কেবল ইসলামই কায়েম করেছে পৃথিবীতে। এবং এমনভাবে কায়েম করেছে যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কোন জাতি তা করতে পারে নি। আমাদের মসজিদে একজন সম্রাট কিংবা একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতাও একজন সাধারণ মানুষের সমান। সেখানে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য বা কোন ভেদাভেদ নেই। অথচ, অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়গুলোতে বড় ও ছোটর মধ্যে ভেদাভেদ আজ-অব্দি বজায় রয়েছে। যদিও সেই জাতিগুলি স্বাধিকার ও সাম্যের কথা মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি জোর গলায় প্রচার করে চলেছে।

[‘নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তোফা (সা.)’ পুস্তক থেকে]।

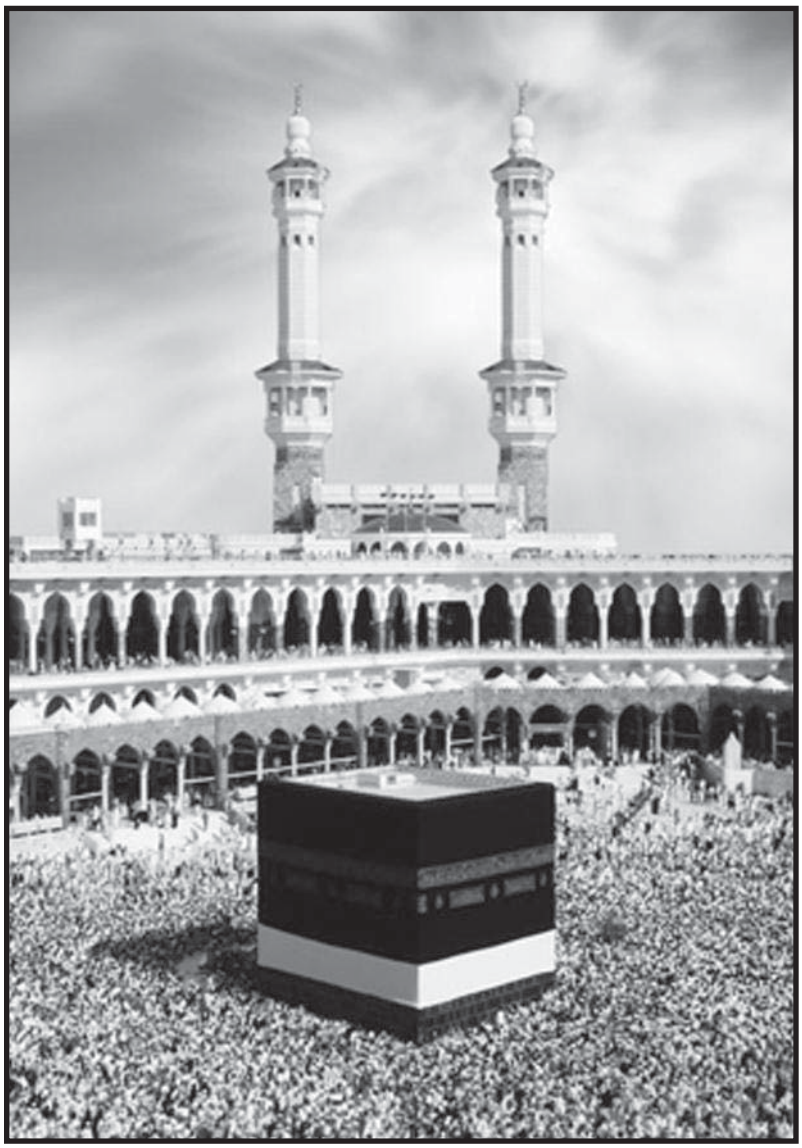

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

“বায়তুল্লাহ্ সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ সুস্পষ্ট এমন নিদর্শন যা ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনের কেন্দ্র মহান উৎস, সর্বকালেই সেটা জীবন্ত”

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

“ফীহে আইয়াতুম্ বাইয়্যেনাতুম্ মাকামু ইবরাহীম ওয়ামান দাখালাহু কানা আমেনান ওয়া লিল্লাহে আ’লান্ নাসে হেজ্জুল বাই’তে মানেস তাতো’আ’ ইলাইহে সাবীলান”

(সূরা আলে ইমরান : ৯৮)

হুযূর (রাহে.) বলেন ঃ–

আমি আমার প্রদত্ত খুতবাগুলোতে ওই তেইশ উদ্দেশ্যের বিষয় বর্ণনা করছি যা কার্যকর করতে আল্লাহ্ তা’লা-ই হযরত

ইব্রাহীম (আ.) কে দিয়ে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্ নবরূপে খাড়া করিয়েছিলেন। আর এটাও বর্ণনা করে যাচ্ছি যে, নবী আকরাম (সা.) এর মাধ্যমে সেই লক্ষ্যসমূহ কীভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। তিনটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমার প্রদত্ত পূর্ববর্তী খুতবাগুলোতে বন্ধুদের সামনে আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছি।

পবিত্র কাবগৃহ বিনির্মাণের ***চতুর্থ উদ্দেশ্য*** এই ছিল অথবা এমনও বলা যায় যে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার চতুর্থ প্রতিশ্রুতি এই ছিল যে ***'ফীহে আইয়াতুম্ বাইয়্যেনাতুম'***–আমি জানিয়েছিলাম যে এ বাক্যাংশে হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে খোদার এই গৃহ এমনই সত্য সাক্ষ্যপূর্ণ প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং ঐকমত্যের সাহায্য-সমর্থনপুষ্ট কেন্দ্রস্থল-মহান উৎস, যা সর্বকালে জীবন্ত থাকবে। অর্থাৎ এই নির্মাণকর্ম দ্বারা এমন উম্মতে মুসলিমা প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন প্রদর্শনের ধারা কিয়ামতকাল অবধি জগতে প্রকাশ পেতে থাকে।

কুরআন করীম এ দাবী করে যে কেবল এরই আজ্ঞানুবর্তীতার ফলশ্রুতিতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত এই দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরো দাবী হলো এই যে, প্রত্যেক জাতিতে ও প্রত্যেক যুগে এমন লোকেরা জন্মগ্রহণ করতে থাকবে যারা এর কল্যাণ ও আশিস থেকে ভাগ নেবে এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাধ্যমে স্বীয় নিদর্শনসমূহের প্রকাশ ঘটাতে থাকবেন।

"আইয়াতে বাইয়্যেনাত" পূববর্তী নবীগণকেও দেয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো এমন 'আইয়াতে বাইয়্যেনাত' ছিল, যার সম্পর্ক কেবলই সেই জাতি ও সে যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র মানবজাতির সাথে সে-সবের সম্পর্ক ছিল না ও সকল যুগের সাথেও না। কিন্তু উদ্ধৃত এই আয়াতে বিষয়বস্তু তো এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে, সকল জাতি, গোষ্ঠী ও সকল যুগের সাথে, এজন্য এ বিষয়বস্তুর গোড়াতেই ***'ইন্না আউয়ালা বাইতেঁও উযেআ লিন্নাস'*** (আলে ইমরান আয়াত নং-৯৭)এর ***'লিন্নাস'*** দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

যদিও পূর্বকালের উম্মতদেরও আইয়াতে বাইয়্যেনাত প্রদান করা হয়েছিল তবে যার সম্পর্ক সকল জাতি-গোষ্ঠী ও সর্বযুগের সাথে, তা কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-কে প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–

বাল হুওয়া আইয়াতুম বাইয়্যেনাতুম ফী সূদূরিল্ লাযীনা উতুল ই'লমা, ওয়া মা ইয়াজহাদু বি আইয়াতিনা ইল্লায্ যোয়ালিমুন।
(সূরা আনকাবুত ঃ ৫০)

এ আয়াতে করীমায় বিষয়বস্তু এটা বর্ণিত হয়েছে যে মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাবে সর্বদা এমন লোক সৃষ্টি হতে থাকবে যাদের পুর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের গুঢ় রহস্যাবলী পূর্ণাকারে ও পরিপূর্ণভাবে দান করা হতে থাকবে এবং ওই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের কারণেই তাদের অন্তরে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ভয়ও পাওয়া যাবে। এর ফলে তাদের অন্তরে স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের জন্য পরিপূর্ণ ভালবাসাও সৃষ্টি করে দেয়া হবে, এতে করে তারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশ পালনকারী এবং সম্মান-ভক্তি ও শ্রদ্ধাকারি হয়ে যাবে। যেহেতু এমন লোক সৃষ্টি হতেই থাকবে, এজন্য ওই ***'আইয়াত বাইয়্যেনাত'*** কুরআন করীমের সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে, বরং বলা

"হে মানব সকল! এটা শুনে নাও যে, সৎকাজ-কর্ম যা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তিনি তোমাদের পূণ্যকর্ম শনাক্ত করে নিবেন। কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়; এ নির্ধারণীর কারণে তাঁর অগণিত কল্যাণসমূহের উত্তরাধিকারী তোমরা হবে।"

যেতে পারে যে কুরআন করীমের সমগ্র দেহাবয়ব জুড়েই মূর্তিমান আয়াত বাইয়্যেনাত বিদ্যমান। ওসব (আইয়াত বাইয়্যেনাত) তাদের বুকভরা ভালবাসা থেকেও নিঃসরিত হতে থাকবে ও কুরআনের মহত্ত্বের ওই আলো দ্বারা জগত সর্বদা আলোকিত হতে থাকবে। তবে উম্মতে মুসলিমার মধ্য থেকে এমন কিছু লোকও সৃষ্টি হবে, যারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অত্যাচারী হবে, কুরআন করীমের কল্যাণের ওই দুয়ারগুলো তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য রুদ্ধকারী হবে। এমন লোকদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার ***আইয়াত বাইয়্যেনাত*** অবশ্যই প্রকাশ পাবে না, তবে ***উতুল ইলমা*** অর্থাৎ অমন লোক, যাদেরকে পরিপূর্ণ ও পুর্ণতাদানকারী জ্ঞান প্রদান করা হবে এরূপ লোক সর্বদা উম্মতে মুসলিমাতে সৃষ্টি হতেই থাকবে এবং 'আইয়াতে বাইয়্যেনাত' এর দুয়ার কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

"সত্য ধর্মের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো যে, এটা মৃত না হয়ে বরং যে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের বীজ গোড়াতে এর মাঝে বপিত হয়েছিল সে-সব কল্যাণ ও মহত্ত্বের আশিসসমূহ মানবকুলের মঙ্গলের জন্য দুনিয়ার শেষ কাল পর্যন্ত এর মাঝে বিদ্যমান থেকে যাবে, যাতে বর্তমান নিদর্শন বিগত নিদর্শসমূহের সত্যায়নকারী হয়–সত্যতার আলোকে, কেচ্ছা কাহিনী রূপে নয়।"

এটা নিছক এক দাবী নয় বরং ইসলামের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা-ই ইসলাম ও মুহাম্মদ রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সত্যতা সাব্যস্ত করার জন্য পৃথিবী ও আকাশ এবং সকল যুগকে নিদর্শন দ্বারা ভরে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ–

সত্য ধর্মের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো যে, এটা মৃত না হয়ে বরং যে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের বীজ গোড়াতে এর মাঝে বপিত হয়েছিল সে-সব কল্যাণ ও মহত্ত্বের আশিসসমূহ মানবকুলের মঙ্গলের জন্য দুনিয়ার শেষ কাল পর্যন্ত এর মাঝে বিদ্যমান থেকে যাবে, যাতে বর্তমান নিদর্শন বিগত নিদর্শসমূহের সত্যায়নকারী হয়–সত্যতার আলোকে, কেচ্ছা কাহিনী রূপে নয়।

অতএব আমি বিস্তৃত এক পর্যবেক্ষণ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখছি যে, আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে নবুয়তের দাবী করেছেন এবং দলীল-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলী জগত সমক্ষে মহান রসূল (সা.) উপস্থাপন করেছেন আজও তা যথার্থরূপে বিদ্যমান আর এর অনুসারী ও অনুবর্তীতাকারীরা এখনও তা পেয়ে থাকে যাতে সেই আধ্যাত্মিক অবস্থানে তারা পৌঁছুতে পারে এবং যথার্থরূপে খোদা দর্শনের সৌভাগ্য তাদের লাভ হয়।" (তবলীগে রেসালত ৬ষ্ঠ সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৪, প্রচারপত্র ১৪ জানুয়ারী ১৮৯৭)

একই ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আব্দুল্লাহ্ জেমস নামক এক খ্রীষ্টানের তিনটি প্রশ্নের উত্তরে লিখিত পুস্তকের 'তাসদীকুন্ নবী'

শীর্ষক নিবন্ধে উল্লেখ করেন–

"কুরআন শরীফের চতুর্থ ঐশী নিদর্শন হলো এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও ছাপ যা সর্বদাই এর মাঝে সংরক্ষিত ও চলমান রয়েছে। অর্থাৎ এর মান্যকারী ও আজ্ঞাবাহী অনুবর্তীতাকারীরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয় মর্যাদার স্তরসমূহে পৌঁছুতে থাকে ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মানে ভূষিত হয়। খোদা তা'লা তাঁদের দোয়া শুনেন ও তাদেরকে কল্যাণময় আশিসপূর্ণ সাড়া প্রদান করেন। কখনও কখনও নবীদের ন্যায় অজানা গোপন রহস্যের ভেদ ও তথ্যাবলীও তাদেরকে জানান ও শেখান এবং নিজের সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন দ্বারা অপরাপর সৃষ্টদের মধ্য থেকে তাদেরকে নির্বাচিত করেন। এটাও এমনই নিদর্শন যা কিয়ামতকাল পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীয়া-তে চলমান রয়েছে এবং সর্বদা প্রকাশিত হয়েও আসছে, এমন কী এখনও তা প্রমাণিত বাস্তব ও প্রকৃতই উপস্থাপিত" (প্রাগুক্ত পুস্তক পৃষ্ঠা-২৩)

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'কিতাবুল বারিয়্যা' পুস্তকে বলেন ঃ–

'ইসলাম'-এ যেরূপে, যেভাবে যে পন্থায়, ইসলামের সমর্থনে ও সাহায্যে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা সাব্যস্ত করতে এই উম্মতের আউলিয়াগণের মাধ্যমে ঐশী নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত

হয়েছে এবং হয়ে চলছে অনুরূপ দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধর্মসমূহে অবশ্যই নেই।

ইসলামই এমন এক ধর্ম, ঐশী নিদর্শনের দ্বারা সর্বদা যার উন্নতি হয়েই চলছে এবং এর অগণিত আলোক ধারা ও আশিসময় কল্যাণ খোদা তা'লার সান্নিধ্য ও নৈকট্য দান করে দেখিয়েও দিচ্ছে। অবশ্যই জেনে রাখো, ইসলাম স্বীয় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন যুগেই লজ্জাবনত মুখে গ্লানি নিয়ে পিছু হটেনি।" (কিতাবুল বারিয়্যা পৃষ্ঠা ৬৭ প্রথম সংস্করণ, রূহানী খাযায়েন খন্ড-১৩)

এ প্রাসঙ্গিকতায়-ই মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ সত্তাকে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা ওই 'আয়াত বাইয়্যেনাত' এর লাখ লাখ সত্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্তা, তাঁর (আ.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামের সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন ছিল, তরতাজা নিদর্শন সমূহ আকাশ হতে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতো। তা কেবল ওই চোখ দর্শন করা থেকে বঞ্চিত হত, যাতে গোড়ামিপূর্ণ পূর্ব বদ্ধমূল ধারণার পট্টি বাঁধা থাকতো। সামান্যতম বোধ ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা সংস্কারমুক্ত তারা এই প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতে পারতো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাথেই ওই আয়াত বাইয়্যেনাত নি.শেষিত হয়ে যায়নি বরং ধর্ম পুণর্জীবিত হওয়ার ফলে ইসলামের অভ্যন্তরে এক সতেজ সজীবতার সৃষ্টি হয়েছে। ওই দুয়ার যা কতক লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে নিজেদের জন্য নিজেরাই রুদ্ধ করে রেখেছিল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা উন্মুক্ত সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন যে ওটা বদ্ধ নয়। তাঁর (আ.) পর তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে নিদর্শন প্রদর্শনের এই ধারা চলমান রয়েছে। হযরত খলীফা আউয়াল (রাযি.) এর জীবন ওই মহান ব্যক্তিগণের জীবন-ই ছিল, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আলোচিত আয়াতের ***উতুল ই'লমা*** বাক্যাংশে উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাযি.)র মর্যাদা তেমনই ছিল। জগত তাঁর (রাযি.) মাধ্যমে হাজার হাজার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে। এখনও সেই মর্যাদার প্রবেশ দ্বারটি বন্ধ নয়। মাত্র কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা, ফজরের নামাযের কাছাকাছি সময় ইস্তেগফারে রত ছিলাম, এক ভয় ও শঙ্কা আমাকে আচ্ছন্ন করছিল, স্বীয় প্রভূ-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা ও মার্জনা ভিক্ষার মুখাপেক্ষী হয়ে দোয়ায় নিয়োজিত ছিলাম, অকস্মাৎ অনুভব করলাম যে অদৃশ্য এক শক্তি আমাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে নিয়েছে। এ অবস্থায় আমার মুখে এ কথা উচ্চারিত হতে থাকলো যে ***"ক্বিয়ামে দ্বীন"*** পরবর্তীতে এক ধাক্কা আমার গোটা শরীর নাড়িয়ে দেয় আর আমি সজাগ অবস্থায় এসে যাই। এর মর্ম আমি এটা বুঝি যে, চলমান এ খুতবার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে জামা'তের সামনে আমি যে কর্মসূচী রাখতে যাচ্ছি তার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং এর স্থায়িত্বের উপকরণ সৃষ্টি করবেন। ইনশাআল্লাহ্!

হাজার হাজার নিদর্শন তো বিদ্যমান রয়েছে-ই, যা মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা চলমান রেখেছেন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে রাশেদ খলীফা বিলীনতায় নিজ সত্ত্বাহারা এক আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থান করেন, এ জন্য সাধারণভাবে ওই সব বিষয় তিনি প্রকাশ করেন না আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে সব বিষয় একান্ত ভালবাসার প্রকাশক হয়ে থাকে, তবে এমন বিষয় ছাড়া যেগুলোর সম্পর্ক জামা'তের সাথে রয়েছে এবং যে সব বিষয় জানিয়ে দেয়া জরুরী।

নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এ কথা বলতে পারি যে খোলাফায়ে রাশেদীনদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বদাই নিষেধ করেন যে, নিজেদের নৈকট্য লাভের কথা যেন খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনান্তে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। ইতিহাস, পূর্ববর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনগণের মাত্র গুটি কয়েক 'আইয়াত বাইয়্যেনাত' সংরক্ষণ করেছে। যেমনটি আমার পর্যবেক্ষণ হলো ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) এর যুগে সাধারণভাবে প্রদর্শিত নিদর্শনের সংখ্যা 'দশ' এর অধিক নয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতের যে খবর বা শুভ সংবাদ হযরত ওমর (রা.) কে দেয়া হয়েছিল তা থেকে মাত্র গুটি কয়েক ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে বেশী নয়, কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নির্দেশনামূলক বর্ণনায় বলেছেন, ভবিষ্যতের হাজার হাজার সংবাদ লাভ এবং ঐশী বাক্যালাপ ও কথপোকথন পূর্ববর্তী ওই বুযুর্গ খোলাফায়ে রাশেদীনগণের সাথেও হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনামূলক বর্ণনা যথার্থ রূপেই সঠিক ও সত্য, এটা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইতিহাস এ প্রসঙ্গে নীরব, এজন্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে ওই বুযুর্গগণ এসব বিষয় প্রয়োজনের মুহূর্ত ছাড়া জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতেন না। কেবলমাত্র ওই বিষয়গুলো ছাড়া যার সম্পর্ক জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত এবং যেগুলো জানানো আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমনটি একবার জামা'তের বিরুদ্ধে যখন ফেৎনা ফাসাদ দেখা দিয়েছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযি.) বলেছিলেন, "যে বিষয়গুলো আমার জানা রয়েছে যদি আমি তা প্রকাশ করে তোমাদের জানিয়ে দিই, তাহলে তোমাদের জীবিত থাকাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।" (উক্তিটি হুবহু আমার স্মরণ নেই তবে বিষয়বস্তু এমনই ছিল)

আমি এটা বলছিলাম যে ***'ফীহে আইয়াতুম বাইয়্যেনাত'***-এর যে প্রতিশ্রুতি ইব্রাহীম (আ.) কে দেয়া হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওই প্রতিশ্রুতি পূরণকারী এবং ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী। আবার হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবনকাল ব্যাপী জগত, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে সাক্ষী হয়ে

রয়েছে। তাঁর (আ.) পর তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে, আহমদীয়া জামা'তের আরও অন্যান্য যে বুযুর্গগণ রয়েছেন তাদের মাধ্যমেও আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন প্রদর্শন করেই চলছেন।

এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কল্যাণ ও আশিসের বদৌলতে তাঁর (আ.) মান্যকারীদের কাছে এর প্রকৃত তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে এ ধরণের বিষয় সাধারণভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়, কেননা এর ফলে আমিত্বের আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে থাকে আর কখনও কখনও এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে এভাবে মানুষ না আবার আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ক্রয়কারী হয়ে যায়।

অতএব কুরআন করীম থেকে এবং যে আদর্শ ও নমুনা উম্মতের আউলিয়াগণ থেকে ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং যে ব্যবহার আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.) এর প্রেমিকদের সাথে ও তাঁর (আল্লাহ্ তা'লার) সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত আত্মোৎসর্গকারীদের সাথে করে থাকেন তাথেকে এটা প্রতীয়মান হয়ে যায়, আর তা অস্বীকার করার জো নাই যে, সকল জাতির মধ্যে ও সকল যুগে ***'আইয়াত বাইয়্যেনাত'*** সগৌরবে বিদ্যমান এবং এর সম্পর্ক কেবল মুসলমানদের সাথে, অন্য কোন ধর্ম এরূপ দাবী করতে পারে না এবং এটা সত্য প্রতিপন্ন করার সামর্থ্যও রাখে না।

পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণের পঞ্চম উদ্দেশ্যঃ 'মাকামু ইব্রাহীম'

এখানে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে ইব্রাহীম (আ.) এর মর্যাদাপূর্ণ এই অবস্থান থেকে আল্লাহ্-প্রেমিক এমন জামা'ত সৃষ্টি হতেই থাকবে, যারা জাগতিক মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কুরবানী করে আত্মবিলীনতার মর্যাদা অর্জনকারী হবে। সঠিকভাবে অনুধাবন করে থাকলে ***'আইয়াতে বাইয়্যেনাত'*** এবং ***'মাকামে ইব্রাহীম'*** এর মধ্যে স্বচ্ছ ও গভীর এক সম্পর্ক বিদ্যমান। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মতের মধ্যে আইয়াতে বাইয়্যনাত এর এক সমুদ্র সর্বদা সচল রয়েছে, কাজেই উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে সম্ভব হয়েছে হাজার হাজার, লাখ লাখ এমন বুযুর্গগণের সন্ধান পাওয়া, যারা মাকামে ইব্রাহীম অর্জনকারী হয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'মাকামে ইব্রাহীম' হলো 'মাকামে মুহাম্মদী '-এর ছায়া (যিল্ল) বা প্রতিবিম্ব। দৃষ্টি ওই মর্যাদার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যা মুহাম্মদ রাসুলূল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদার স্তর, এটা তো সম্ভব নয়। তবে সেই স্তরের অধ:স্তন মর্যাদার যে স্তর তা হলো 'মাকামে ইব্রাহীম'। এক প্রতিবিম্ব রূপেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) ওই আইয়াত বাইয়্যেনাত থেকে ভাগ নিয়েছেন। কুরআন করীম এ দাবী করে যে, আমার মান্যকারীদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় এমন ব্যক্তিদের সৃষ্টি হবে যারা আত্ম-বিলীনতার ওই মর্যাদা লাভকারী হবে। আত্মবিলীনতার মর্যাদা, সেটা আবার কী জিনিস! এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ

"প্রেমময় সত্ত্বা, মর্যাদার এক স্তর, যার উপর পবিত্র কুরআন শরীফের পরিপূর্ণ মান্য ও পালনকারীকে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে এবং তার স্পন্দনবাহী ধমনী ও শিরায় ঐশীপ্রেম এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে রাখে যে, ওটাই তাঁর নিজ জীবন সত্তার মূল উপাদান বরং তার জীবনেরও জীবন (জানের জান')এ পরিণত হয়।

প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রতি এক অসাধারণ রকমের বিস্ময়কর ভালবাসা তার অন্তরে স্ফুরিত হয়ে দোলা দেয়, অসাধারণ অলৌকিক এক আকর্ষণ তার পরিশুদ্ধ হৃদয়কে ছেয়ে ফেলে, অপরাপর সবকিছু থেকে কর্তিত, বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত করে নিয়ে ঐশীপ্রেমের উদগ্র বাসনা ক্রমেই উজ্জ্বলতর হতে থাকে, যা সাহচর্যে অবস্থানকারীদের স্বভাব-চরিত্রে, গুণাবলীতে, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতেও পরিস্ফুটিত ও প্রকাশিত হয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত দলীলরূপে দৃশ্যমান হয়..... এবং সর্বাধিক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সততা ও একনিষ্ঠতার প্রতীক চিহ্ন এটাই যে, সে সবক্ষেত্রেই তার প্রেমাস্পদকে অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

আবার যদি তাঁর পক্ষ থেকে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ এসে উপস্থিতই হয়, তবে প্রেমময় সত্তার বিজয় প্রকাশের সাক্ষ্যদানকারী হয়ে সেটাকে পুরস্কাররূপে গ্রহণ করে নেয় এবং বিপদ-আপদকে স্নিগ্ধ মজাদার মিষ্ট পানীয়-ই মনে করে। কোন তরবারীর তীক্ষ্ণ ধার, তার আর তার প্রেমাস্পদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঢুকিয়ে দিতে পারে না। কোন সর্বোচ্চ বিপদ আপদও তাকে তার সেই আপন প্রেমাস্পদের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। এটাকেই (প্রেমাস্পদের স্মরণ-কে) নিজ জীবন বলে সে জানে এবং তাঁরই প্রেমের মাঝে স্বাদ ও মজা পায় ও তাঁর সত্তাকেই অস্তিত্ববান বলে বিশ্বাস করে ও তাঁরই স্মরণ ও জপগাঁথাকে জীবনের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়। চাওয়ার যদি থাকে তো তাঁকেই, সুখ-আনন্দ পাওয়ার থাকলে তাঁরই কাছে, সমগ্র জগতের মধ্য থেকে তাঁকেই আপন করে নেয় আর নিজেকে তাঁরই জন্য নিবেদন করে রাখে।

বেঁচে থাকা তাঁরই জন্য মরণটাও তাঁরই উদ্দেশ্যে, জগতে বাস করেও ইহজগতের না। সত্ত্বা নিয়ে অবস্থান করলেও আত্মহারা। কার্যতঃ মান-সম্মান, সুনাম বা নিজের আরাম-আয়েশ কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কী নিজ জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ নেই 'একমাত্র সত্ত্বা'র সান্নিধ্যের সেই একজনকে পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব দিয়ে সবকিছু খুঁইয়ে বসে। অদম্য অন্তর্জালায় দগ্ধিভূত হয়েও বর্ণনার ভাষা তার নেই যে, কেন এই দহন, মর্মযাতনায় বাকরুদ্ধ ও হতবিহ্বল হয়ে সব রকম বিপদাবলী, অপমান ও বদনাম সয়ে নিতে প্রস্তুত থাকে এবং এতেই সে মজা ও স্বাদ পায়।" (বরাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৪৫০, ৪৫১, টীকা-পাদটীকা নং ৩)

এমনিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

এই পবিত্র জামা'তকে এভাবে চিত্রিত করে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর প্রতিশ্রুতি ও শুভ সংবাদ অনুযায়ী যেমনটা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন ঃ–

লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মাগণের পর্যবেক্ষণ এটাই যে কুরআন শরীফের অনুগমন ও অনুবর্তীতায় হৃদয়-অন্তরে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে দয়াময় প্রভূর সাথে অদ্ভূত অসাধারণ এক সংযোগ সাধিত হয়ে যায়।..... আর পারস্পরিক এই মিলনে ঐশী প্রেমের মজাদার এক স্বাদ তাদের অন্তরে সংস্থাপিত হয়ে সংরক্ষিত হয়, এ অবস্থায় যদি তাদের সার্বিক অস্তিত্ব ও দেহ-সত্ত্বাকে দুঃখকষ্ট ও বিপদাবলীর হামান-দিস্তায় পেষণ করে ***বামার প্রেস*** (প্রচন্ড চাপদ্বারা তুলার গাঁইট বাঁধার যন্ত্র) এর ভিতর দিয়ে প্রচন্ড চাপে নিংড়িয়ে নেয়া যায় তাহলে প্রাপ্ত সেই নির্যাসে ঐশীপ্রেম-খোদার ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন অস্তিত্বের সন্ধান মিলে না। পার্থিবতায় লিপ্ত জগত এ অভিজ্ঞান রাখে না, কারণ উন্নততর ও মহত্তর সেই অবস্থান পার্থিবতা থেকে বহু যোজন দূরে বিরাজমান। (সুরমা চশমায়ে আরীয়াঁ, টীকা পৃষ্ঠা-৩১)

এটাই হলো সেই মাকামে ইব্রাহীম যার প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে দেয়া হয়েছিল। এ শুভ-সংবাদই হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বীয় প্রভূ-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা যিনি 'সত্য প্রতিশ্রুতি' দানকারী, তিনি সেই প্রতিশ্রুতি সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়েছেন এবং উম্মতে মুসলিমা-তে লক্ষ লক্ষ এমন পবিত্র সত্ত্বার অধিকারী ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন যারা মর্যাদায় উন্নতি লাভ করে মাকামে ইব্রাহীম পর্যন্ত উপনীত হয়েছেন।

ষষ্ঠ প্রতিশ্রুতি যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে প্রদান করা হয়েছিল তা এ আয়াতের ***'ওয়ামান দাখালাহু কানা আমেনান'*** অংশে বিধৃত হয়েছে। আমি পূর্বে বলেছিলাম এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে যারা বায়তুল্লাহ-য় প্রবেশ করবে অর্থাৎ নির্ধারিত সেই ইবাদত সম্পন্ন করবে যার সম্পর্ক খোদা তা'লার পবিত্র এ গৃহের সাথে রয়েছে, ইহজগতের ও পরকালের নরক থেকে মুক্ত হয়ে তারা খোদা তা'লা প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্রয়ে এসে যাবে, তাদের বিগত সকল পাপ মার্জনা করা হবে এবং নরকের অগ্নি থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাবে। 'ওয়ামান দাখালাহু কানা আমেনান' যে কেউ এ গৃহে প্রবেশ করলে, ওই অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে (যা খোদা তা'লা অস্বীকারকারীদের জন্য প্রজ্জলিত করে রেখেছেন)।

যেমন আল্লাহ্ তা'লা সূরা নমলে উল্লেখ করেছেন ***'ওয়া হুম্ মিন ফাযাইয়্যে ইয়াওমা এযিন আমেনুন'*** (আয়াত নং ৯০) অর্থাৎ ইসলামের পথনির্দেশনা অনুযায়ী আমলে সালেহ (সময়োপযোগী সৎকর্ম) সম্পাদনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন ও শেষ প্রলয়ের শিঙ্গাধ্বনি বেজে উঠা কালে এমন লোকেরা নরকের শাস্তি পাবার ভয় থেকে শঙ্কামুক্ত থাকবে। সে সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ শুভ-সংবাদ দান করবেন যে, তোমাদেরকে নরকের চুল্লির দিকে ধাবিত করা হবে না বরং জান্নাতের পানে সাদরে আমন্ত্রণ করা হবে। অতএব কোনই ভয় বা শঙ্কা করো না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা অপর এক স্থানে বলেন,

"ইন্নাল মুত্তাকীনা ফী জান্নাতেঁও ওয়া উ'ইউনিন। উদ খুলুহা বিসালামিন আমিনীন" (সূরা আল হিজর, আয়াত নং ঃ ৪৬, ৪৭)। খোদাভীরুগণ অবশ্যই বর্ণাঢ্য ফুলে শোভিত বাগান ও ঝর্ণাধারা সুশোভিত গৃহে প্রবেশ লাভ করবে। তাদেরকে বলা হবে যে তোমরা প্রশান্তির সাথে ভয় ও শঙ্কামুক্ত হয়ে সে স্থানে প্রবেশ করো। এ হলো সেই পূর্ণ নিরাপত্তা যা কুরআন করীমের মাধ্যমে, এর পরিপূর্ণ অনুগতদের লাভ হয়ে থাকে।

তিঁনি (আল্লাহ্) বলেন, ***'মান দাখালাহু কানা আমেনান'*** বাস্তবিক পক্ষে এই একই কথা আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.)কেও বলেছেন, সেই সাথে এ-ও বলেছেন, আমরা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ***"লাতাদ্ খুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইনশাআল্লাহ আমেনীন*** (সূরা আল ফাতাহ্, আয়াত নং ২৮) অর্থাৎ তুমি পবিত্র মসজিদে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ করবে আর সে প্রতিশ্রুতি পূরণও হয়েছে।

দৃশ্যতঃ এর এক ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ্ তা'লাই মক্কা বিজয়ের বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও অবস্থা সৃষ্টি করে দেন আর যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মক্কার কাফিরেরা (যারা নিজেদের সারাটা জীবন ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতেই লেগে রয়েছিল) অস্ত্র সমর্পন করলো আর ফিরিশতারা যারা উর্ধ্বালোক থেকে অবতরণ করলো তা এদের অন্তরে এতটা ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করলো যে তাদের যুদ্ধের সাহসই রইল না।

কিন্তু এর তাৎপর্যপূর্ণ অপর একটি অর্থ এ-ও যে, তোমরাই ওই উম্মত (জাতি) যারা এ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা দানকারী যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে এ বাক্যের দ্বারা করা হয়েছিল যে, ***'ওয়ামান দাখালাহু কানা আমেনান'***। অর্থাৎ যে এতে প্রবেশ লাভ করবে সে-ই নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে। তোমাদের মাধ্যমেও সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পেয়েছে। আমি এরই বিশদ বর্ণনা করছি যে, এ প্রতিশ্রুতির সবটা এমনই যার সম্পর্ক সমগ্র মানবজাতির সাথে–প্রত্যেক জাতি ও প্রতিটি যুগের সাথেও। কোন বিশেষ জাতির সাথে বা যুগের মধ্যে এটা বিশেষায়িত বা সীমাবদ্ধ নয়।

তাহলে ***"মান দাখালাহু কানা আমেনান"*** এর অর্থ এটা দাঁড়ালো যে দুনিয়ার যে কোন জাতির সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকুক না কেন, যে কোন যুগের সাথেই কাল কাটাক না কেন, যে কেউই ***'মানাসেক-এ-হজ্জ'*** একাগ্রতার সাথে একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবে, সে নরকের অগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে যে নবী করীম (সা.) বলেছেন,***'হাজ্জা ফালাম ইয়ারফাছ ওয়া লাম ইয়াফসুক***

“লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মাগণের পর্যবেক্ষণ এটাই যে কুরআন শরীফের অনুগমন ও অনুবর্তীতায় হৃদয়-অন্তরে ঐশী কল্যাণ অবতীর্ণ হয়ে দয়াময় প্রভূর সাথে অদ্ভূত অসাধারণ এক সংযোগ সাধিত হয়ে যায়।”

গুফেরালাহু মা তাকাদ্ দামা মিন যাম্‌বেহী (মনে রাখা উচিত যে ‘ইয়ারফাছ’ ও ‘ইয়ারফেছ’ এবং ইয়াফসুক ও ‘ইয়াফসেক’ আরবী ভাষায় শব্দগুলো দুভাবেই বলা হয়ে থাকে) অর্থাৎ যে ব্যক্তি নোংড়া ও বাজে কথা পরিহার করে চলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করে ও মানাসেক-এ-হজ্জ পালনকালে বাজে কথা থেকে আত্মরক্ষা করে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এটা যে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এমনই পবিত্র যে বাজে কথা তার মুখে আসেই না।

এর তাৎপর্য এটা নয় যে অবশিষ্ট এগারো মাসের কিছু কাল জুড়ে সে সবরকমের অশালীন বাজে কথা বলতেই থাকে আর কেবল এ (হজ্জব্রত পালনের) দিনগুলোতে অশালীন কথা-বার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। বরং উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এটাই যে, যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা এতটাই পুত-পবিত্র হয়ে গিয়েছে এবং নোংড়া অপবিত্রতা আর বাজে কথা অন্তর থেকে এত দূরে নির্বাসিত হয়েছে যে, নোংড়া কথা তার মুখে আসতেই পারে না। সে সত্য ও নায়পরায়ণতা এবং সংশোধন ও সন্ধির পথ থেকে সরে যায়নি অর্থাৎ বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুনের বাইরে না গিয়ে বাধ্য-বাধকতার সাথে তা পালন করে আর অনুগত বান্দাদের মর্যাদা সমুন্নত রাখায় প্রচেষ্টারত থাকছে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে। তদ্রুপ গভীর মনোনিবেশপুর্ণ আমলের সাথে নিষ্ঠাবান শিষ্টাচারপুর্ণ আমল করে যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ-য় হজ্জ পালন করে তার সাথে আল্লাহ্ তা’লার প্রতিশ্রুতি যে তার বিগত সকল পাপ মোচন করা হবে। এভাবে যার অতীতের যাবতীয় পাপের মার্জনা হয়ে যাবে, নিশ্চিত তাকে নরকের অনল থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

আরও এক পন্থায় মানুষ ইহজগতে ও পরলোকে নরকের অনল থেকে রক্ষা পেয়ে যায় আর তা এভাবে যে ‘মান দাখালাহু’-যে মাকামে ইব্রাহীমে প্রবেশ করে ‘কানা আমেনান’-আল্লাহ্ তা’লা প্রদত্ত শান্তি ও স্বস্তি এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বলয়ে সে এসে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ–

“খোদার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি ও মহিমা এবং ক্ষমতা ও পরাক্রম রয়েছে..... কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর মহিমা ও পরাক্রমের এ রহস্য তার কাছেই প্রকাশিত হয়, যে তাঁরই হয়ে যায়। তিঁনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তার প্রতিই দিয়ে থাকেন যে ব্যক্তি নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনে আর তাঁরই আস্তানায় গড়াগড়ি দিতে থাকে নগন্য ও অবহেলিত নিশ্চল এক কণার মত, যা অবশেষে মুক্তায় রূপ নিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, আর স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বিশ্বস্ততাপুর্ণ প্রেমের তেজস্ক্রিয়তায় নমনীয় ও বিগলিত হয়ে তাঁরই পানে ছুটতে থাকে। তখন তিঁনি বিপদাপদে তাঁর খোঁজ-খবর নেন, আর শত্রুদের হীন পরিকল্পনা ও গোপন ষড়যন্ত্র থেকে আশ্চর্য্যজনকভাবে তাদের রক্ষা করেন ও মর্যাদার অবমাননা হওয়া থেকে তাদের হেফাযত করেন।

তিনি স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক হয়ে যান। এমন সব বিপদাবলী আপতিত হয় যাতে মানুষের কিছুই করার থাকে না সেক্ষেত্রেও তাঁর সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে তিনি তাদের সহায়তা দান করেন। কতটা কৃতজ্ঞ থাকার ব্যাপার যে আমাদের খোদা বড়ই দয়াবান ও মহা পরাক্রমশালী খোদা। এরপরও কী তোমরা এমন প্রিয় বান্ধবকে পরিত্যাগ করতে পারো?! নিজ আত্মাকে অপবিত্র করতে তাঁর বিধি-বদ্ধ ব্যবস্থা ও নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করতে থাকবে?! অপবিত্র জীবন ধরে রেখে বেঁচে থাকাটার চেয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ‘সাথী’ করে মৃত্যুবরণ করাটাই আমাদের জন্য শ্রেয়।” (আইয়্যামুস সুলাহ, পৃষ্ঠা-১০৪)

এটা হলো সেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা, যা ওই ব্যক্তিরই অর্জন হতে পারে যে নিজের উপর এক মৃত্যু আনয়ন করে অনস্তিত্বের পোশাক নিজ গায়ে জড়ায় ও মাকাম ইব্রাহীমে প্রবেশ লাভ করে। তখন আল্লাহ্ তা’লার সেনা-সামন্তরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে থাকে ও সব রকম বিপদ আপদ থেকে তাকে সুরক্ষা প্রদান করে। আল্লাহ্ তা’লা নিজ অনুগতদের

উপর দু'টি দাবানলকে বিজয়ী হতে দেন না। একটি হলো তার ওই বান্দারা যারা প্রেমাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে বিলীনতার স্তর যখন লাভ করে তখন অপর দাবানলের দুয়ার তাদের জন্য রুদ্ধ করে দেয়া হয়।

আবার অমন অনুগতরাও আছে যারা (আল্লাহ্ তা'লার) প্রেম-ভালবাসার কোন ভ্রুক্ষেপই করে না, তারা তাঁর দান ও অনুকম্পায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী নয় বরং তাঁর কৃপাসমূহের অস্বীকারকারী, এরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে একান্তভাবে দুনিয়ামুখী লালসায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছে। তাঁকে প্রেমাস্পদ বানাবার পরিবর্তে দুনিয়ার চাক-চিক্যকে পার্থিব জগতের সম্পর্ককে নিজের প্রেমাস্পদ নির্ধারণ করে নিয়েছে, এমন লোকদের প্রতি খোদার সুরক্ষার অবতরণ হয় না, তাঁর সেনা সদস্যরা অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান তো করেই না বরং নরকের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দেয়া হয় জাহান্নামের দাবানল তাদের ঠিকানায় পরিণত হয়।

অতএব, দু'টি দাবানল খোদার অনুগতদের উপর নিপতিত হয় না। এটা তাদের স্বনির্ধারণ যে, তারা নিজেরাই প্রেম-প্রীতি ভালবাসার অনল পসন্দ করে মন্দসমূহকে দগ্ধিভূত করবে, স্বীয় আশা আকাঙ্ক্ষা, নিজ সত্তা ও নিজ প্রেমিককেও, নিজের পরিবার পরিজন ও সম্পর্ককেও ছাড়বে; নাকি খোদার প্রেমের চাইতেও পার্থিব জগতের ভালবাসাকে প্রাধান্য দেবে আর স্বহস্তে নিজের জন্য জাহান্নামের দুয়ার খুলে নিবে।

সপ্তম প্রতিশ্রুতি হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে দেয়া হয়েছিল যে কেবল তোমার বংশধরদের উপরই এই হজ্জ ফরয থাকবে না বরং এমন এক নবীর আবির্ভাব এখানে ঘটানো হবে যার শরীয়ত বিধি-বিধান বিশ্বজনীন হবে আর সেই শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর জগতের জাতিসমূহের উপর হজ্জ ফরয (অবশ্য পালনীয়) করে দেয়া হবে আর এভাবে খোদার এ পবিত্র গৃহকে সৃষ্টির কেন্দ্র ***মরজএ' খালাইক*** ও জগৎ-ইহজগৎ ও পরজগতের কেন্দ্র ***মরজএ' আলম*** বানিয়ে দেয়া হবে।

অতএব আমরা দেখতে পাই হযরত নবী আকরাম (সা.) এর আগমনের পূর্বে এ প্রতিশ্রুতি পুর্ণ হয় নাই। তবে যেখানে নবী করীম (সা.) আবির্ভূত হলেন আর কুরআনের শরীয়ত তাঁর (সা.) উপর অবতীর্ণ হলো তখন ওই শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাই মানবজাতির উপর 'হজ্জ'কে ফরয (বাধ্যতামূলক) করে দিলেন। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ ***"আলহাজ্জু আশহুরুম্ মাঅ্'লুমাতুন ফামান্ ফারাযা ফীহিন্নাল হাজ্জা ফালা রাফাছা ওয়া লা ফুসুকা ওয়ালা জিদালা ফিল হাজ্জে ওয়া মা তাফআ'লু মি খায়রিয়্য ইয়াঅ্'লাম্হুল্লাহ"*** (সূরা বাকারা আয়াত নং ১৯৮) অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমরা স্মরণ রেখো যে হজ্জের মাস সকলের চেনা জানা ও পরিচিতির জন্য। অতএব যে কেউ হজ্জকে নিজের উপর ফরয মনে করে হজ্জ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে এবং হজ্জের দিনগুলোতে (যেমনটি অন্যান্য দিনগুলোতে) স্থূল কামনা বাসনার কোন কথা বা অকৃতজ্ঞ মন্দ কোন কথা বা কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদের কথা বলবে না। এটা তাদের জন্য বৈধ হবে না।

আরও বলেছেন যে, সৎকর্ম যেটা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ অবশ্যই তার মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে শনাক্ত করে ফেলবেন, তিনি এটা বিবেচনায় আনবেন না যে তোমার বংশগত সম্পর্ক শ্বেতাঙ্গদের সাথে না কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে, বরং তুমি যে কোন জাতিগোষ্ঠীর সদস্যই হও না কেন, ভূপৃষ্ঠের পশ্চাৎপদ কোন অংশের বাসিন্দাই হও না কেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ***'লাব্বায়েক'*** (আমি উপস্থিত) বলে হজ্জকে খোদা তা'লার আদেশ অনুযায়ী নিজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত মনে করবে আর যখন সেই শর্ত তোমার স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করবে যার সম্পর্ক রয়েছে হজ্জ করার সাথে আর সেই ফরয (অবশ্যকরণীয়) কে বাধ্যতামূলক জেনে তোমরা হজ্জ করবে আর হজ্জ পালনকালীন সময়ে ওই যাবতীয় নির্দেশনা যথোপযুক্তভাবে পালন করবে যে সমস্ত পথ নির্দেশনা আল্লাহ্ তা'লাই এ প্রসঙ্গে তোমাদের দিয়েছেন।

অথএব, "হে মানব সকল! এটা শুনে নাও যে, সৎকাজ-কর্ম যা-ই তোমরা করবে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তিনি তোমাদের পূণ্যকর্ম শনাক্ত করে নিবেন। কোন বস্তুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়; এ নির্ধারণীর কারণে তাঁর অগণিত কল্যাণসমূহের উত্তরাধিকারী তোমরা হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বায়তুল্লাহর হজ্জ কেবল প্রকাশিত দৃশ্যমান মানাসেক হজ্জেরই নাম নয়, বরং ইসলামে প্রতিটি ইবাদতের আড়ালে ওটার এক রূহ (আত্মা) অর্থাৎ অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে।

দৃশ্যমান ইবাদত দেহের বা বাহিরাবরনের কোমনীয়তা সজীবতা ইত্যাদি রক্ষা করে। এর আড়ালে রয়েছে এক আত্মা, যে ব্যক্তি আত্মার যত্ন নেয় না আর শুধু দেহেরই যত্ন-আত্তিতে ব্যতিব্যস্ত সে এক মৃতদেহের পরিচর্যাকারী, তার ওই ইবাদতের, যার আত্মার (অন্তর্নিহিত তাৎপর্য) খেয়াল রাখা হয় নাই, এর কোনই পুণ্য লাভ হবে না, বরং তার সাথে তার প্রভু-প্রতিপালকের সেই ব্যবহারই হবে যা মৃতপূজারী এক ব্যক্তির সাথে হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হজ্জ সম্পর্কে বলেন ঃ

"প্রকৃত কথা এটা যে, আধ্যাত্মিক জগতের অভিযাত্রী (সালেক)-এর শেষ অবস্থা বা মর্যাদার এমন স্তর যে কামনা বাসনা ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আর পরম উপাস্যের প্রেমে বিভোর হয়ে যাবে। প্রেম ও ভালোবাসা তা যদি সত্যিই হয় তবে সে স্বীয় জীবন ও নিজ অন্তর উৎসর্গ করে দেয় আর বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে প্রদক্ষিণ ওই উৎসর্গীকরণেরই দৃশ্যমান এক নিদর্শন। যেমনটি এক বায়তুল্লাহ্ ইহজগতের ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে তেমনি উর্ধ্বালোকেও এটি বিদ্যমান। যতক্ষণ সেটার প্রদক্ষিণ করা না হয় এরও প্রদক্ষিণ হয় না। এর (ইহজগতের বায়তুল্লাহ্-র) প্রদক্ষিণকারীরা সকল

পরিধেয় পোশাক খুলে ফেলে দেহে একটিই মাত্র কাপড় রাখে, কিন্তু সেটার (উর্ধ্বলোকের) প্রদক্ষিণকারী সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে খোদার কারণে খোদারই জন্য বিবস্ত্র হয়ে যায়। প্রদক্ষিণ করা, পরম উপাস্যের প্রতি প্রেম ভালোবাসার ঐশীপ্রেম- প্রকাশক এক বাহ্যিক নিদর্শন। প্রেমিক তাঁর (প্রেমাস্পদের) চারপাশে ঘুর ঘুর করে। এমন যে, তার নিজস্ব ইচ্ছা ও সন্তোষের কিছুই আর বাকী থাকে না। সে তাঁরই পাদপীঠে উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে।" (সিরাতুল হাকায়েক, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

অতএব এটাই হলো আধ্যাত্মিক হজ্জ, যতক্ষণ কেউ সেই বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ না করে, জাগতিক হজ্জ পালনও গ্রহণীয় হতে পারে না, তাই হজ্জ পালনকারীরা, হজ্জ পালনের নিয়্যতকারীদের এ বৈশিষ্ট্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য যে ইবাদতসমূহ রয়েছে সেগুলো আমরা করে নিয়েছি আর যেগুলো আধ্যাত্মিক ইবাদত, যেগুলোর উপর আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ক্রিয়াশীল হয়, সে ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই যে গৃহীত হলো নাকি হলো না।

এ সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদতের পর কোন প্রকারের গর্ব ও অহঙ্কার এবং আমিত্ব ও আত্মম্ভরিতা কেন সৃষ্টি হতে যাবে! এতে করে তো স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের সাথে আরও বেশী দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, মহিমাগীতি গাওয়া উচিত, এটাই সঠিক বটে, তবে ওটা সেরকমই যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যে মুহূর্তে খোদার প্রিয় বান্দা স্বীয় প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন হয়ে থাকে আর বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি মিনতি সহকারে সেজদাপ্রণত হয়ে রয়, ওই মুহূর্তে আবার কোন ব্যক্তি যদি তাকে দেখে ফেলে, সে অবস্থায় পড়ে তার মনে এতটাই লজ্জা অনুভূত হয়, যেভাবে তার লজ্জা অনুভূত হতো জাগতিক সম্পর্কের কোন বিষয়ে এভাবে ডুবে থাকা অবস্থায় বাইরের কেউ দেখে ফেললে।

অতএব, এটা একান্ত প্রেমের কথা অন্যদের কাছে ফাঁস হয়ে পড়ার মত। নিবীড় প্রেমের এ কথা তো বান্দা ও তার প্রভূ-প্রতিপালকের মধ্যকার এক গোপন রহস্য, এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, জগত এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয় কেননা, তিনি ইহজাগতিকতার উর্ধ্বে ও পার্থিবতা থেকে সূক্ষ্মতর, কিন্তু যে জাতি খোদা তা'লাকে ছেড়ে পার্থিবতার সন্নিকটে আসতে চায় আর প্রগতি ও উন্নতি পরিত্যাগ করে ***খুলুদ ইলাল আরয*** করে থাকে যাতে তাকে দুনিয়ায় মূল্যাবান জ্ঞান করা হয় ও তার প্রশংসা করা হয়, এতে করে সে দুনিয়ার প্রতি তো ঝুঁকে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান থেকে ছিটকে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'লা সকলকে আত্মম্ভরিতা থেকে রক্ষা করুন। এবং যেমনটি তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে দিয়ে নিজের উম্মতদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন ওই শুভ সংবাদ অনুযায়ী লাখ লাখ পবিত্রাত্মা যারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও এখনও হচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও হতে থাকবেন–ওই পবিত্রাত্মাগণের সাথে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং অন্তর্ভুক্ত রাখুন। আমরা দুনিয়ার প্রশংসা কুড়াতে চাই না তবে খোদা এমন উপায় উপকরণ সৃষ্টি করে দিন যে, তিনি আমাদের অন্তরে লালিত কোন নেকী- সৎ কর্ম ও আকাঙ্ক্ষাই, সে এক সরিষা বীজের সমানই হোক না কেন তিনি শনাক্ত করতে শুরু করুন আর ওই সরিষা বীজের সমান সৎকর্ম ও আকাঙ্ক্ষার বিনিময়ে প্রেম ভালোবাসা দিন ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

আল্লাহ্ করুন এমনই হোক।

[মসজিদে মুবারক, রাবওয়া ১২ মে ১৯৬৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ, দৈনিক আল ফযল, ২১ মে ১৯৬৭]

['হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে যারীয়াহ বায়তুল্লাহ কী আযসারে নাঁও তা'মীর কে তেইস আযীমুশ্‌শান মাকাস্যেদ'–পুস্তক থেকে অনুদিত]

ভাষান্তর: ***মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্***

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

ঈদুল আযহা'র খুতবা

"আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ফজল ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকেই তাঁর পথে কুরবানী পেশ করবার তওফিক দিন, যাতে আমরা ঐসব নেয়ামত পাই, যার সুসংবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং কুরবানীর এই ঈদে যে প্রকৃত বরকতরাজি নির্ধারিত আছে, খোদা করুন, আমাদের সকলেরই যেন তা লাভ করার সৌভাগ্য হয়"

সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক মসজিদ আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত ৫ই জানুয়ারি ১৯৭৪-এর ঈদুল আযহা'র খুতবা

"মহানবী (সা.) মানবতার নির্যাস ছিলেন। তাঁরই জন্য সকল জগতের সৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিত্বে মানব জাতি খোদা তা'লার গুণাবলীর পরম মনোহর প্রভা প্রত্যক্ষ করে।"

তাশাহহুদ, তায়া'উয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.) বলেন :–

এমনিতে প্রথম নবী থেকে নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত মানবজাতিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনিত শরীয়তের দায়িত্ব বহনের জন্য যোগ্যতা দানের কাজ কোন না কোন প্রকারে জারি ছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আলাইহে সালামের সময় হতে এ শিক্ষার কাজে বিশেষ জোর দেয়া হল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম এবং তাঁর বংশধরগণ সেই ভূখন্ডে, যেখানে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব নির্ধারিত এবং যে জাতি তাদের কাঁধে সর্বপ্রথম এই মহা গুরুভার গ্রহণ করবে তাদের শিক্ষার কাজ অধিকতর জোর দিয়ে চালাতে থাকেন এবং সহস্র সহস্র বৎসর যাবত শিক্ষার ফলে আরববাসী তাদের প্রকৃতিগত শক্তির দিক হতে কুরআন করীমের শরীয়ত বহনের এবং কামেল শরীয়তের দায়িত্ব নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন করে।

অন্য কথায় এটা ছিল এক বুনিয়াদ, যা একের পরে এক নবীর দ্বারা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করা হচ্ছিল এবং সহস্র সহস্র বৎসরের শিক্ষা ও প্রস্তুতির পরে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বি'সাত, তথা নবীরূপে আগমন হয়। তিনি মানবতার নির্যাস ছিলেন। তাঁরই জন্য সকল জগতের সৃষ্টি। তাঁর ব্যক্তিত্বে মানবজাতি খোদা তা'লার গুণাবলীর পরম মনোহর প্রভা প্রত্যক্ষ করে। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানব জাতি মানবীয় শক্তিসমূহের কামাল তথা পূর্ণ অভিব্যক্তির দর্শন লাভ করে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সাথে মানুষের কাঁধে এক নতুন ধরণের দায়িত্ব অর্পিত হল। তাঁর বি'সাতের পর এই বুনিয়াদের ওপর ধাপে ধাপে রূহানী মহল উচ্চ হতে উচ্চতর করা হতে থাকে এবং তা প্রশস্ত হতে প্রশস্ততর হতে থাকে। এমনকি, আমাদের যুগে এই জামানায় তা চরম রূপ ধারণ করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

এখন মানবজাতি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

“ঈদুল আযহা খোদা তা’লার হুযূরে কুরবানী পেশ করবার স্মৃতি তাজা করে। আহমদীয়া জামা’তের বন্ধুগণ দিনরাত কুরবানী পেশ করছেন আর দুনিয়া তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, ‘মুবারকবাদ’ দিচ্ছে মুহাম্মদী কল্যাণাবলীর পরিধি ক্রমবৃদ্ধি করবার দায়িত্বও এ যুগে আহমদীয়া জামা’তের ওপর অর্পিত হয়েছে।”

সাল্লামের মহান রূহানী দূর্গে সমবেত হবে এবং শয়তানের সর্বপ্রকার আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে মানুষ খোদা তা’লার ‘হাম্‌দ’, তাঁর প্রশংসাগীতি গাইতে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রূহানী ফয়েজের (কল্যাণ) পরিধিকে ক্রমবর্ধমান বর্ধিতাকারে বিস্তৃত করবার দায়িত্ব মুহাম্মদীয় উম্মতের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। এখন এই যুগে এই দায়িত্ব তার চরম রূপ গ্রহণ পূর্বক মুহাম্মদীয় উম্মতের ঐ সম্প্রদায়ের ওপর স্থাপিত হয়েছে, যাকে ‘আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত’ নাম দেয়া হয়েছে, এবং এর ভিত্তি স্থাপন করেন হযরত মাহ্‌দী মাহুদ ও মসীহে মাওউদ আলাইহেস সালাম।

এই সেই জামা’ত, যা আল্লাহ্ তা’লার হুযূরে কুরবানী পেশ করছে, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা ও তাঁর প্রেম-উৎস হতে প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীকে এর সৌন্দর্য ও উপকারিতা–‘হুসন ও ইহ্‌সান’ দ্বারা বিমুগ্ধ করে ওয়াহেদ খোদার দিকে আনবে। অর্থাৎ, এই জামা’তের এটাই কর্মসূচী যে, এটা ইসলামের বিশ্বাসকে যথাসম্ভব প্রশস্ত ও উচ্চ করবার জন্য সতত যত্নবান থাকবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও, তুচ্ছ বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর নিপীড়িত ও উপেক্ষিত জামা’ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা’লার হুযূরে প্রফুল্ল মনে ইসলামের এই রূহানী প্রাসাদের প্রশস্ততার উপকরণ সৃষ্টি করার জন্য সার্বিক চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্ হামদুলিল্লাহে আলা যালেক– (তজ্জন্য আল্লাহ্ তা’লারই সম্যক প্রশংসা)।

আমাদের এই ঈদ মূলতঃ কুরবানীর শিক্ষা দেয়। এই ঈদ দ্বারা খোদা তা’লার হুযূরে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরবানী দিয়ে আসার স্মৃতি তাজা করে। আহমদীয়া জামা’তের স্ত্রী পুরুষ, ছোট বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি খোদার রাহে কুরবানী দেওয়ায় মশগুল। এজন্য আমি এই ঈদের ‘মুবারকবাদ’

এই জামা’তের এটাই কর্মসূচী যে, এটা ইসলামের বিশ্বাসকে যথাসম্ভব প্রশস্ত ও উচ্চ করবার জন্য সতত যত্নবান থাকবে।

পেশ করছি এবং দোয়া করছি যে, এই কুরবানীর সাথে যে সকল বরকত পাওয়া যাচ্ছে, আল্লাহ্ তা’লা তা আরো বৃদ্ধি করুন এবং আপনারা সকলেই আল্লাহ্ তা’লার ঐ সকল নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হউন। যার সুসংবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এই সব সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবীগণও উল্লেখ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও মহান নেয়ামত সমূহের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর বিনীত অনুবর্তীগণও ঐগুলোর উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা’লা তাঁর ফজল ও অনুগ্রহে আমাদের সকলকেই তাঁর পথে কুরবানী পেশ করবার তওফিক দিন, যাতে আমরা ঐসব নেয়ামত পাই, যার সুসংবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং কুরবানীর এই ঈদে যে প্রকৃত বরকতরাজি নির্ধারিত আছে, খোদা করুন, আমাদের সকলেরই যেন তা লাভ করার সৌভাগ্য হয়। আল্লাহুম্মা আমীন।

(১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ইং, সাপ্তাহিক ‘বদর’ কাদিয়ান)

(৩১ আগষ্ট, ১৯৮৪, পাক্ষিক আহমদী থেকে পরিমার্জনকৃত)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

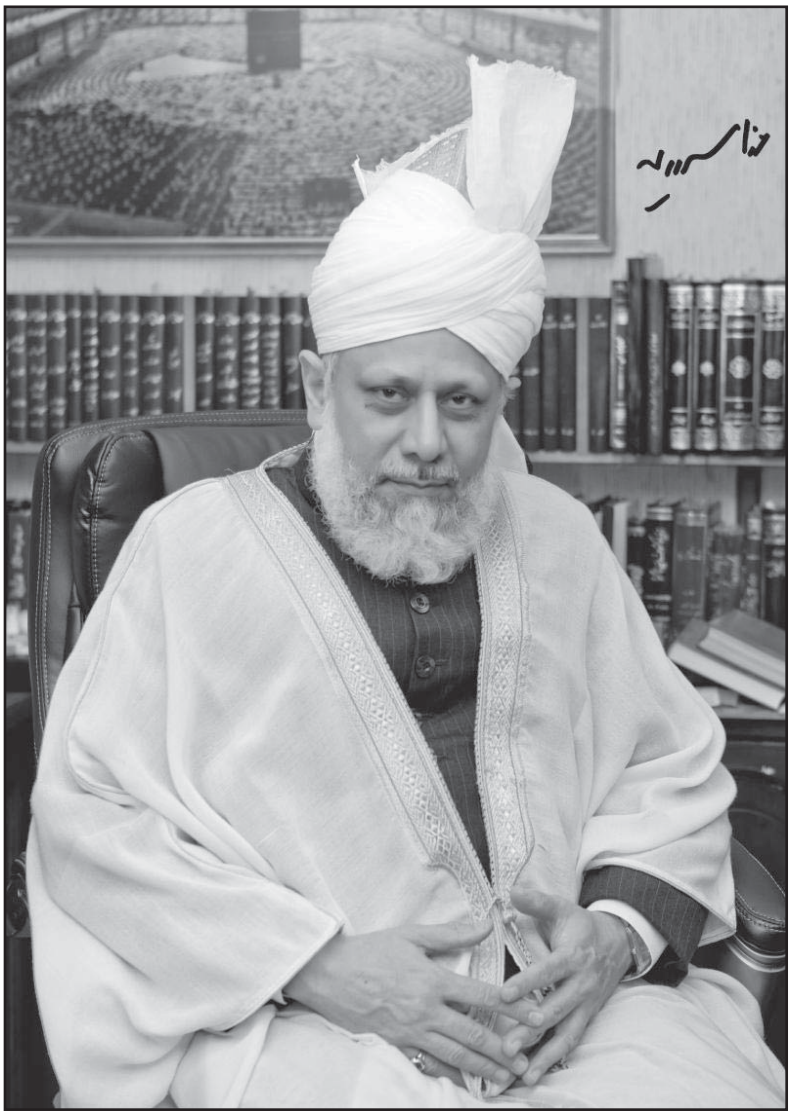

২৭শে মে, ২০১৪ তারিখে খেলাফত দিবস উপলক্ষে এমটিএ'তে সম্প্রচারিত আরবী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা

খেলাফতের ১০৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রথমে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন, যা আমরা প্রতিবছর খেলাফতের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনরূপে প্রত্যক্ষ করি আর বিগত একটি শতাব্দী একথার জ্বলন্ত সাক্ষী। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকায় দু'প্রকার কুদরতের উল্লেখ করেছেন। প্রথম কুদরত হচ্ছে, নবুয়ত আর দ্বিতীয়টি হল, খেলাফত।

দ্বিতীয় কুদরতের বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তিকায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এবং তিরোধানের পর চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল, চতুর্দিকে উৎকণ্ঠা ছেয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে দন্ডায়মান করেন এবং তিনি পুনরায় ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করেন।

আর আয়াতে ইস্তেখলাফের বরাতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করেছেন যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, একমাত্র খেলাফতই শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এরপর এই সান্ত্বনাও দিয়েছেন, আমার যাবার পর দ্বিতীয় কুদরতের দৃশ্য তোমরা প্রত্যক্ষ করবে আর এই দ্বিতীয় কুদরত চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এসব কথা থেকে কি বুঝা যায়? এটি সুস্পষ্ট যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বরাত দিয়ে এবং আয়াতে ইস্তেখলাফ উদ্ধৃত করে, দ্বিতীয় কুদরত চিরস্থায়ী হবার সংবাদ দিয়ে তাঁর পর তাঁর খেলাফতের ধারা বজায় থাকার সুসংবাদ আমাদের দিয়েছেন। কোন মুজাদ্দিদ এর কথা নয় বরং তিনি বলছেন, তাঁর মৃত্যুর পর যিনি তৎক্ষণাৎ দন্ডায়মান হবেন এবং ধর্মের সংস্কার করবেন তিনি খলীফা হবেন। আমার পর এক প্রতিনিধি আসবেন আর তোমরা তাঁর হাতে বয়আত করবে।

তিনি বলেছেন, আমার পরে তিনি আমার নামে তোমাদের বয়আত নিবেন। তিনি কোন আঞ্জুমানকে বয়আত নেয়ার অধিকার দেননি। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা ও একটি শিক্ষণীয় ঘটনাও আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। রাবওয়াতে

“হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খেলাফত চিরস্থায়ী হবার যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন তা শুধু তাঁর নিজের কথা নয় বরং মহানবী (সা.)-এর মুখ হতে এই সুসংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। আর আজ খোদা তা’লার ব্যবহারিক সাক্ষ্যও একথার সত্যায়ন করে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ হতে সমর্থনপুষ্ট।”

একজন গয়ের মোবাঈন (যিনি দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত করেননি) যারা খেলাফত হতে পৃথক হয়ে দ্বিতীয় খেলাফতের শুরুতেই লাহোর চলে গিয়েছিল তাদেরই বংশধরদের একজন তৃতীয় খলীফার যুগে রাবওয়া আসেন এবং (জামা’তের) উন্নতি ও শৃঙ্খলা দেখে খুবই অবাক হয়ে বলেন, সত্যিই এসব বিষয় আমাদের মাঝে নেই।

এরপর রাবওয়া হতে চতুর্থ খলীফার হিজরতের পর ঘটনাক্রমে তার আবার রাবওয়া আসার সুযোগ ঘটে। সেই একই ব্যবস্থাপনা ছিল, আঞ্জুমান ছিল আর কাজও আগের লোকেরাই করছিল, কিন্তু সে (ব্যক্তি) এটি দেখে বলতে আরম্ভ করে, এখন আমি বুঝতে পারছি, আঞ্জুমানের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা সেভাবে চলছে না যেমনটি যুগ খলীফার উপস্থিতিতে এখানে চলছিল। যাহোক, যুগ খলীফার কোনো স্থানে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার একটি বিশেষ কার্যকরীতা যে রয়েছে যা অন্যরাও অনুভব করেন।

এছাড়া মুজাদ্দিদের যতটুকু প্রশ্ন তা তো আমি বলেই দিয়েছি, যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আর যেসব কথা তিনি (আ.) বলেছেন তাতে এটি পুরোপুরি বাতিল সাব্যস্ত হয়। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একথাও বলেছেন, ‘আমি শেষ সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ।

অতএব, তাঁর অনুসরণে আহমদীয়া খেলাফতই ধর্ম-সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং একই সময় একাধিক মুজাদ্দিদও এসেছেন বলে ইতিহাস আমাদের অবহিত করে। তাদের যুগ ছিল সীমিত, যখন তিরোধান করেছেন তখন তাদের অনুসারীদের মাঝে পুনরায় বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সীমিত স্থানের জন্য ছিলেন, যে অঞ্চলে ধর্ম সংস্কারের কাজ করতেন সেই গন্ডিতেই থাকতেন, সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকতেন। আর ধর্ম সংস্কারের দিক থেকেও তাদের কাজ সীমিত ছিল, অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ নোংরামী ও দুর্বলতা যা মুসলমানদের মাঝে দেখা দিয়েছিল সেই এলাকায় তিনি তাদের সংশোধন করতেন।

অনেকে এমন ছিলেন, যারা ধর্ম-সংস্কারের কাজ করেছেন কিন্তু স্বয়ং নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবী করেননি বরং অন্যরা তাকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দিয়েছেন বা পরে তাদের সম্পর্কে বলেছেন, উনি মুজাদ্দিদ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে খোদা তা’লা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তাহলো, তাঁর ও আমাদের মনিব ও অনুসরনীয় নেতা খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে খাতামুল খোলাফা, খাতমুল আউলিয়া এবং শেষ সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

যেভাবে মহানবী (সা.) গোটা বিশ্বের জন্য, সকল যুগের জন্য, প্রত্যেক জায়গার জন্য, সকল প্রকার নোংরামী দূরীভূত করার জন্য, পৃথিবী হতে নৈরাজ্য দূর করার জন্য এসেছিলেন তদ্রুপে এ যুগে আল্লাহ্ তা’লা তাঁর আনুগত্যে এসব নোংরামী দূরীভূত করার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল যুগের জন্য এবং গোটা বিশ্বের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করেছেন। কাজেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কোনভাবেই সাধারণ মুজাদ্দিদদের গন্ডিভুক্ত করা উচিত নয়। কেননা, স্থান ও কাল এবং তাঁর ধর্ম-সংস্কারের কাজ সকল স্থান-কাল এবং সর্বপ্রকার নোংরামী ও বি’দাত দূর করা পর্যন্ত তাঁর যুগ বিস্তৃত।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), তাঁর পর কিয়ামতকাল পর্যন্ত খেলাফতের ধারা যা গোটা বিশ্বে তাঁর কাজ চলমান রাখবে তা বজায় থাকার সুসংবাদ আমাদের প্রদান করেছেন। আর এই

সুসংবাদ মূলত মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসের বরাতেই দিয়েছেন, যাতে তিনি (সা.) নবুয়তের পর খেলাফতে রাশেদার ধারা সূচিত হবার এরপর উৎপীরণমূলক ও স্বৈরসাশকদের ধারা আরম্ভ হবার এবং অন্ধকার যুগ আসার চিত্র অঙ্কন করে পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর তা কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবার কথা।

অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খেলাফত চিরস্থায়ী হবার যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন তা শুধু তাঁর নিজের কথা নয় বরং মহানবী (সা.)-এর মুখ হতে এই সুসংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। আর আজ খোদা তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্যও একথার সত্যয়ন করে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে সমর্থনপুষ্ট।

বিশ্বে কুরআন অনুবাদের কাজ, পৃথিবীময় ইসলাম প্রচারের কাজ এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিকার ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়া এবং কোটি কোটি মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্যের জোয়াল বয়আতের পর নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়া, এটি কোন মানুষের চেষ্টার ফসল হতে পারে কি? এখন আপনারা যারা 'এমটিএ'র সামনে বা টিভি সেটের সম্মুখে বসে এমটিএ'র অনুষ্ঠান দেখছেন এবং বিশ্বের সর্বত্র একই সময় যুগ খলীফার বিভিন্ন খুতবা শোনা যায়, অনুষ্ঠান দেখা যায় এটি আহমদীয়া জামা'তের সামর্থের নিমিত্তে কোন বস্তুবাদী মানুষ চিন্তাও করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষের এই একপি দলীল-ই কি যথেষ্ট নয়? জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলেও আজ বস্তুবাদী অনেক মানুষ আছে যাদের ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ঠিকই কিন্তু অনেক সময় দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য আহমদীয়া খেলাফতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন আমি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষামালা তুলে ধরার সুযোগ পাই এবং বিশ্ববাসীকে একথা বলার সুযোগ ঘটে, তোমরা যদি নিজেদের মুক্তি চাও তাহলে এসব নীতি অবলম্বন করো। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো, এবং দ্বৈত নীতি পরিহার করো তবেই তোমরা শান্তি অর্জন করতে পারবে। এমনটি হলে পরেই তোমরা নিজেদের জীবনকে সুনিশ্চিত করতে পারবে, আর এই জগতেও যদি তোমরা মুক্তি পেতে বা নিরাপত্তা লাভ করতে চাও তাহলে তোমরা তা লাভ করতে পারবে।

আমি পূর্বেও 'এমটিএ'র কথা বলেছি, এ প্রসঙ্গে আরো বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের 'এমটিএ'র যে নিয়ামত দান করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, বিশ্বের সকল দেশে এর ব্যবস্থা বিদ্যমান। এটি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারীদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা সবাই একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, মোটকথা এর কারণে আহমদীয়া জামাতের মাঝে এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। এবং এসব কিছুর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা এর একটি মাধ্যম নির্ণয় করেছেন। কিন্তু খেলাফতের আনুগত্য এবং খেলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং খেলাফতের (সঙ্গে সম্পৃক্ততার) পুরস্কারের গুরুত্ব অনুধাবনের ফলে মানুষের মধ্যে, সকল আহমদীর ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে এর তুলনায় উত্তম ঐক্য ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আহমদীরা এক খলীফার ইশারায় ওঠা-বসা করে।

আল্লাহ্‌র কাছে আমি দোয়া করি, এই বাণী এবং এর কার্যকারীতা অনুধাবন করার, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে মহানবী (সা.)-এর পতাকা বিশ্বময় উড্ডীন করার এবং এক খোদার রাজত্ব ধরাধামে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সবাই যেন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করি আর উম্মতে মুসলেমাও যেন এই গুঢ় দায়িত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

বিশেষভাবে আরব বিশ্বের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর এই সর্বশেষ বাণীটি অনুধাবন করে। যাতে তিনি আরব-অনারব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মাঝ থেকে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব, এখন মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের দাসত্ব এবং খেলাফতের আনুগত্যই আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণের একমাত্র উপায়, এছাড়া অন্য আর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এটি বুঝার তৌফিক দিন, এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের তৌফিক দিন এবং এই বাণীটি নিজ নিজ গন্ডিতে প্রচারের তৌফিক দিন। যাতে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই মিশনটি পূর্ণ করতে সক্ষম হই, যে দায়িত্ব আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এই ইলহামী বাক্যে অর্পণ করেছিলেন, অর্থাৎ, 'এ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে এক ধর্মের পতাকাতলে সমবেত করো'।

কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি লাভের জন্য যেভাবে আরববাসীরা ইসলামের প্রথম যুগে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছিল এখন ইসলামের সত্যিকার চিত্র বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য ইসলামের পুনর্জাগরণের সময়ও আপনারা নিজেদের ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দিন।

অতএব, আজ বিশ্বের সকল দেশে বসবাসরত আরব আহমদীরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করুন, আপনাদেরকে এই দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌র কৃপায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আর আমি স্বয়ং এর সাক্ষী, আরব বিশ্ব আহমদীয়া খেলাফতের সঙ্গে, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সেসব আহমদী যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছেন তারা আহমদীয়া খেলাফতের সঙ্গে পরম বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সম্পর্ক রক্ষা করেন।

অতএব, এই নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ককে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করুন যাতে আমরা অচিরেই. যতদ্রুত সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পতাকা বিশ্বময় উড্ডীন করে জগতময় ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করি। জাযাকাল্লাহ্। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

(হুযূর আনোয়ার (আই:)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–১৭)

চতুর্থতঃ 'মুরতাদ' সংক্রান্ত উল্লেখিত হাদীসটির ব্যাপারে বর্ণনা–সুত্রের ধারাবাহিকতা–মূলক শৃঙ্খলের মধ্যেকার সংযোগকারী বর্ণনাকারীদের জীবন–চরিত গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এই হাদীসটি 'আহাদ গারীব' (হাদীসের পরিভাষায় যার অর্থ হলো একটি এমন হাদীস যার বর্ণনাকারীদের শৃংখলা একটাই এবং সূত্রও একই। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসের একমাত্র সূত্র 'ইকরামা' ছিল ইবনে আব্বাসের ক্রীতদাস (মনে রাখা আবশ্যক যে, এই ইকরামা এবং আবু সুফিয়ানের পুত্র ইকরামা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি)।

হাদীসের গবেষণা–কারীগণ বলেছেন যে, ছোট বেলা থেকে ইকরামা কাজে–কর্মে অমনোযোগী ছিল, সে ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)–এর প্রচন্ড বিরোধী ছিল এবং খারিজীদের পক্ষ অবলম্বনকারী ছিল। উল্লেখ্য যে, ইমাম মালেক বিন আব্বাস (রহ.) (৯৫–১৭৯হিঃ) ছিলেন হাদীসের একজন বিখ্যাত সংকলনকারী এবং 'ফিকাহ' বা আইন–শাস্ত্রের একজন ইমাম এবং সমগ্র মুসলিম জাহানে যাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করা হয়–তিনি স্বয়ং ইকরামার বর্ণিত হাদীসগুলোকে অবিশ্বাসযোগ্য বলে রায় দিয়ে গেছেন (মিজান আল– আইতাদাল খন্ড–২, পৃঃ– ২০৯)। অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ইমাম ইয়াহইয়া–বিন–সাঈদ আল আনসারী, আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আতা–বিন রাবাই (ফাতহ আল–বারী)।

পঞ্চমতঃ উল্লেখিত হাদীসে ইবনে আব্বাসের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সম্ভব যে, হাদীসটি ইকরামার নিজের বানানো এবং সে তা চালিয়ে দিয়েছিল তার মনিব ইবনে আব্বাসের নামে। এমন বদভ্যাস যে তার ছিল তা বলে গেছেন স্বয়ং আলী বিন ইবনে আব্বাস (ফাতহ–আল বারী–এর বরাতে)।

ষষ্ঠতঃ উক্ত হাদীসে বর্ণিত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কিত তথ্যটি বিশ্বাস–যোগ্য নয়। কারণ হযরত আলীর (রা.) মোকাম ও মর্যাদার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারার শাস্তি নিতান্তই অসংগতিপূর্ণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে 'খাতামুল আউলিয়া' বা 'অলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম" এবং 'আসাদুল্লাহ' বা 'আল্লাহ্‌র সিংহ' উপাধী দ্বারা ভূষিত করেছেন। ফলতঃ তাঁর মোকাম–মর্যাদার সঙ্গে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিপরীতে কোন ধর্ম–ত্যাগীকে পুড়িয়ে মারার প্রশ্ন অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অগ্রহণযোগ্য।" [১৬]

সপ্তমতঃ উক্ত হাদীসে ব্যবহৃত 'যিন্দীক' শব্দটি মূলতঃ ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভুত। ইকরামা নিজেও পারস্যের লোক ছিল। সে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই শব্দটি উক্ত হাদীসের অন্তর্গত করেছে এবং এরূপ একটি শব্দ হযরত বসুল (সা.)এর প্রতি অন্যায়ভাবে আরোপ করেছে । আরো উল্লেখ্য যে, ফৌজদারী আইনে শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই শব্দটি দ্বারা এমন ধর্ম–বিরোধী ব্যক্তিকে বুঝায় যার প্রচারণা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক (ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড–২, পৃ–৩৫৭ দ্রষ্টব্য)। এই সংগা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধ তথা শৃংখলা– ভঙ্গকারী এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরাই যিন্দীক সংগার অর্ন্তভুক্ত যে কারণে তারা অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি–যোগ্য অপরাধী।

অষ্টমতঃ ধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদন্ড প্রদানের হাদীসগুলোর উদ্ভব ঘটেছে মূলতঃ বসরা, কুফা এবং ইয়েমেনের ঘটনাবলী থেকে। হেযাজ তথা মক্কা ও মদীনার জনগণ এগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে অপরিজ্ঞাত ছিলেন। ইকরামা বর্ণিত হাদীসটি একটি ইরাকী হাদীস যেগুলো সাধারণভাবে সবটাই সন্দেহজনক হিসেবে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ অভিমত পোষণ করেছেন (মক্কী ইমাম তাউস বিন কাইসান) [১৫]

নবমতঃ ইকরামার কথা বাড়িয়ে বলার বদভ্যাস ছিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ–ইমাম ইয়াহিয়া–বিন–সাঈদ আল আনসারী এবং আলী বিন আব্দুল্লাহ–বিন–আব্বাস, আতা–বিন–রাবাই (ফতহ–আল–বারী)। মৌলানা আব্দুল হাই (লখনৌ) ইকরামা প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, ইমাম বুখারী যেহেতু

ইকরামাকে তাঁর সংকলনে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, সেহেতু বাদ বাকী সবাই স্বতন্ত্রভাবে আর কোন অনুসন্ধান না করেই তা–ই অনুসরণ করেছেন (আব্দুল হাইঃ "আল রাফে ওয়াল তকমীল)। [১৫]

"একটি ধর্মান্ধ এবং অমানবিক মতবাদ"

"ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড"–এই ধর্মান্ধ ও অমানবিক মতবাদের প্রবক্তারা এটা কল্পনাও করতে পারে না যে, আন্তর্জাতিক ও আন্তঃধর্মীয় মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের এই মতবাদের প্রভাব ও ফলাফল কী হতে পারে। তারা কেন এটা দেখতে পায় না যে, তাদের ব্যাখ্যা–যুক্ত ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, এতে করে অন্যান্য সকল ধর্মের অনুসারীদের তো ধর্ম পরিবর্তন করবার অধিকার থাকবে বটে, কিন্তু মুসলমানদের সেই অধিকার থাকবে না; তাদের মতে অন্যান্য সকলকেই ধর্মান্তরিত করবার একক অধিকার (Prerogative) কেবল ইসলামেরই থাকবে; কিন্তু অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে? ইসলামী সুবিচারের কত নিকৃষ্ট এই দৃশ্য, যা তারা উপস্থাপিত করছেন। উপসংহারে বলা প্রয়োজন যে,

* ধর্মত্যাগ (ইরতেদাদঃ Apostasy) হচ্ছে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার পূর্ববর্তী ধর্মকে পরিস্কারভাবে বর্জন করা।

* মতাদর্শগত পার্থক্য, তা যত গভীরই হোক না কেন, তা কখনই ধর্মত্যাগ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

* ধর্মত্যাগের শাস্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত, এ অপরাধ তাঁর বিরুদ্ধেই করা হয়।

* ধর্মত্যাগ যদি অন্য কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে বেড়ে না যায়, তাহলে তা এই পৃথিবীতে শাস্তিযোগ্য হবে না।

* এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র শিক্ষা।

* এটাই ছিল রসূলে পাক (সা.)–এর শিক্ষা।

* এই অভিমতকেই পাকা বা কনফার্ম করেছেন হানাফী আইন বিশারদরা, ফতেহ আল–কাদির, চালপি, হাফিয ইবনে কাইয়েম, ইব্রাহীম নাখাই, সুফিয়ান সৌরি এবং আরো অনেকেই। [হেদায়াহ; ফতহ–আল কাদীর (খন্ড ৪); চালপি, তফসীরঃ ফতহ আল কাদীর, ৩৮৮; ইনায়াহ ৩৯০]

* মওদুদী–বাদীদের যে দাবী, তাদের সেই হাদীসটির 'সহীহ' হওয়া সম্পর্কে,–তা স্রেফ একটা কল্পিত কাহিনী মাত্র।" [১৬]

বর্তমান যুগে 'মুরতাদ' সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক অপ–প্রচারের কিছু নমুনা

বর্তমান যুগে ধর্মের নাম ব্যবহার করে এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী পশ্চাতে ফেলে কতকগুলো উগ্রবাদী এবং জঙ্গীবাদী মতাদর্শ প্রচারের দৃষ্টান্ত দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেশে দেশে ঐ সকল মতাদর্শের ভিত্তিতে বোমাবাজী, সন্ত্রাসী এবং সহিংস তৎপরতার জন্য অগনিত জঙ্গীবাহিনী সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তারা ধর্মের নামে সাধারণ জনগনসহ বিভিন্ন দেশের আইন–শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিনের দৈনিক পত্র–পত্রিকা এবং গণ–মাধ্যমে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনাবলী প্রচারিত হয়ে চলেছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও এই ধর্মের নাম ব্যবহার করে যে বা যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে তারা কখনই ইসলামের বন্ধু হতে পারে না। ইসলামের মূল শিক্ষার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তারা ধর্মকে পার্থিব স্বার্থোদ্ধার এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপ–ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা অস্ত্রের জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি–মূলক ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বুঝতে চায় না যে, এ যুগে অস্ত্র নয়, কলমের জিহাদের প্রয়োজন। *[বিষয়টি সম্পর্কে আরো জানার জন্য হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রহ.) প্রণীত "ধর্মের নামে রক্তপাত", "Murder in the Name of Allah" এবং বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান" পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য]*

উগ্রপন্থী মতাদর্শের প্রচারকারীদের মধ্যে বর্তমান যুগে যারা খুবই তৎপর তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আবুল আলা মৌদুদীর নিম্নোক্ত উদ্বৃতিগুলো তার অপ-ব্যাখ্যা ও অপ–প্রচারের কিছু নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো । এই সকল উদ্ধৃতি হতে মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে তার মতাদর্শ যে কত ভয়ংকর এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের মূল শিক্ষার সঙ্গে কতখানি অসংগতিপূর্ণ তা খুবই স্পষ্ট। এই উদ্ধৃতিগুলো নিম্নরূপঃ [১৭]

১) মৌদুদী জামায়াত থেকে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

"মুরতাদকে কতল করার এই অর্থ ভূল হইবে যে, আমরা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইয়া মুনাফেকী নীতি অবলম্বনে বাধ্য করি।.....প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টা। যাহারা বহুরূপী এবং মত পরিবর্তনকে ক্রীড়া বিশেষে পরিণত করিয়াছে, আমরা তাহাদের জন্য আমাদের জামা'তে প্রবেশের দ্বার বন্ধ করিতে চাই। .... সুতরাং, ইহা প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা যে, এই জামা'তে প্রবেশেচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্বেই জানান হয় যে, এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু–যাহাতে সে প্রবেশের পূর্বে শতবার ভাবিয়া লইতে পারে যে, এইরূপ জামা'তে তাহার ভর্তি হওয়া উচিত, কি অনুচিত।" ['মুরতাদ কি সাজা', ৫১–৫২ পৃঃ]

২) জামাতে ইসলামী হতে যারা সরে পড়ে তাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য মওদুদী সাহেবের ইরতেদাদের ফাতওয়া হলোঃ "ইহা ঐ পথ নহে, যাহাতে অগ্রসর হওয়া ও পশ্চাদপদ হওয়া দুই–ই এক। না, এখানে পিছনে হাটিবার অর্থ 'ইরতেদাদ'।"

['রোইদাদে জামাতে ইসলামী', ১ম খন্ড, ৮ পৃঃ]

৩) মুসলমানদিগের মধ্যে অমুসলমান-গনের তবলীগ করার অধিকার সম্পর্কে মৌলনা মৌদুদী সাহেবের পরিস্কার উত্তর হলোঃ

"এই সমস্যার অনেকখানি সমাধান ধর্মত্যাগীর জন্য হত্যা–দণ্ডের আইনই করিয়া দিয়াছে ['না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশরী' –উদ্ধৃতি দাতা]। কারণ, যখন আমরা আমাদের এলাকার মধ্যে কোন মুসলমানকে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ গ্রহণ করিবার অধিকার দিই না, তখন ইহার অপরিহার্য অর্থ ইহাই যে, আমরা দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যে ইসলামের মুকাবিলায় অন্য

কোন আহ্বান উত্থিত এবং প্রসারিত হওয়াকেও সহ্য করিতে পারি না।"[মুরতাদ কি সাজা ইসলামী কানুন মে, পৃঃ ৩২]

৪) মৌলানা মৌদুদীর মতে মুরতাদের জন্য দুটি মাত্র ব্যবস্থা উন্মুক্ত রয়েছেঃ

"তাহার জন্য দুটি মাত্র ব্যবস্থা সম্ভব। হয়, তাহাকে রাষ্ট্রের মধ্যে সর্ব প্রকার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া জীবিত থাকিতে দেওয়া অথবা তাহার জীবন সাঙ্গ করা। প্রথম অবস্থা কার্যতঃ দ্বিতীয় অবস্থা হইতে কঠিন শাস্তি। কারণ ইহার অর্থ এই যে, 'উহাতে সে মরিবেও না, এবং জীবিতও থাকিবে না'–অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং তাহাকে মৃত্যু–দন্ড দিয়া তাহার ও সমাজের বিপদ এককালে শেষ করা ভাল।"['মুরতাদ কি সাজা', ৫১ পৃঃ]

৫) বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অ–ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর বিলোপ সাধনের ঘোষণা করতঃ মৌলানা মৌদুদী বলেনঃ

"সুতরাং এই পার্টির পক্ষে হুকুমত হস্তগত করা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।" ['হকিকতে জিহাদ', ৫৯পৃঃ]।.... "ইসলাম এই বিপ্লব কোন এক দেশে বা কয়েকটি দেশে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে আনিতে চায়। যদিও প্রথমতঃ মুসলিম পার্টির ইহাই কর্তব্য যে, তাহারা যেখানে যেখানে থাকে সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করিবে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি বিশ্ব–জনীন বিপ্লব ব্যতীত আর কিছুই নয়।"--- "একদিকে এই মুসলিম পার্টি সকল দেশের অধিবাসীকে এই নীতি মানিয়া লইতে আহ্বান করিবে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত, অপরদিকে ঐ পার্টির শক্তি থাকিলে যুদ্ধ করিয়া অ–ইসলামী রাষ্ট্রগুলির বিলোপ সাধন করিবে।"['হকিকতে জিহাদ',৬৩–৬৪ পৃঃ।]

৬) মৌদুদী সাহেবের একটি অদ্ভূত পরিকল্পনার এক ঝলকঃ

"যে এলাকায় ইসলামী বিপ্লব প্রকাশ পায়, সেখানে মুসলমান অধিবাসীদিগকে নোটিশ দিতে হইবে যে, যাহারা আকিদা ও আমলের দিক দিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং বিমুখ হইয়া থাকাই পছন্দ করে,ঘোষণার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে অমুসলমান হওয়ার রীতিমত প্রকাশনা দিয়া এজতেমায়ী নেযাম হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে । এই সময়ের পরে যাহারা মুসলমানগনের বংশে জন্মগ্রহন করিবে, তাহাদিগকে মুসলমান গন্য করা হইবে। তাহাদের ওপর সম্যক ইসলামী আইন–কানুন প্রয়োগ করা হইবে। ধর্মের সকল ফরজ ও ওয়াজিব বিষয়গুলি তাহাদিগকে বিনা ব্যতিক্রমে পালন করিতে বাধ্য করা হইবে।

অতঃপর, ইসলামের গণ্ডির বাহিরে যে পদার্পন করিবে, তাহাকে কতল করা হইবে। এই ঘোষণার পর চরম চেষ্টা করা হইবে, যাহাতে মুসলমানের জন্মিত ছেলে ও মেয়েরা কুফরের অঙ্কে না যায় এবং যাহাতে তাহাদিগকে রক্ষা করা যায়। অতঃপর, যাহাদিগকে কোন প্রকারেই রক্ষা করা যাইবে না, বুকে পাথর বাঁধিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য আমাদের সমাজ হইতে ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। এই শুচিকর কার্যগ্রহণের পর ইসলামী সমাজের সুচনা কেবল সেই মুসলমানদের দ্বারা করা হইবে, যাহারা ইসলামে রাজী আছে।" ['মুরতাদ কি সাজা', ৮০–৮১ পৃঃ]

জঙ্গীবাদ বনাম যুক্তি–জ্ঞান–ভিত্তিক মতাদর্শঃ কোনটি গ্রহণযোগ্য ?

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে উগ্রবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে যে ধারণা প্রকাশিত হয় তা পবিত্র কুরআন, মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর সুন্নত এবং পবিত্র কুরআনের মৌলিক শিক্ষার সংগে সংগতিপূর্ণ সকল হাদীসের মূল শিক্ষার দ্বারা কখনই সমর্থন–পুষ্ট নয়। ইসলাম–প্রচার সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি এবং কিভাবে তা বাস্তবক্ষেত্রে অনুসরণ করা প্রয়োজন তা উত্তমভাবে অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। বিষয়টি সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা 'সুলতানুল কলম' হিসেবে প্রকৃত ইসলামী সমাধান প্রদান করেছেন (পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। প্রসঙ্গক্রমে চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.)–এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটির সংগে মৌলানা মৌদুদীর উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো তুলনা করে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। [১৮]

"ইসলাম ধর্মান্তরিত করণের ওপরে খুব বেশী জোর দেয়। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এটা বাধ্যকর যে, সে আল্লাহ্‌র পথে একজন প্রচারক হবে।

"বর্তমান যুগে ধর্মের নাম ব্যবহার করে এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী পশ্চাতে ফেলে কতকগুলো উগ্রবাদী এবং জঙ্গীবাদী মতাদর্শ প্রচারের দৃষ্টান্ত দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেশে দেশে ঐ সকল মতাদর্শের ভিত্তিতে বোমাবাজী, সন্ত্রাসী এবং সহিংস তৎপরতার জন্য অগনিত জঙ্গীবাহিনী সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তারা ধর্মের নামে সাধারণ জনগনসহ বিভিন্ন দেশের আইন–শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে।"

সুতরাং, এটা কত বড় একটা পরিহাস যে, আজকাল বহু বিখ্যাত মুসলিম উলেমা ইসলামী জেহাদের মূল তাৎপর্যকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছে। কেননা, তারা এই সংকীর্ণমনা ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করছে এবং স্পর্ধাভরেই করছে যে, ইসলাম নির্দেশ দেয়, যে কেউ তার ধর্ম পরিহার করলে, –এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে–ইসলামকেই বোঝানো হয়, তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে।

তাহলে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বেলায় কি হবে? ইসলাম ঘোষণা করে, মুসলমানদের জন্য এটা বাধ্যকর যে, তারা তাদের চারপাশের অমুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করার মহান ব্রতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে, এবং সেই লক্ষ্যে সব সময় শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এই দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এত প্রয়োজনীয় যে, তা পালন করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আমরণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তুমি হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু–প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সঙ্গে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সব চাইতে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু–প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে; এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা আন্–নহল, ১৬ঃ১২৬)

মৌদুদীবাদীগণ এবং তাদের সম–মনাদের দ্বারা প্রভাবিত গোষ্ঠী অথবা কোন প্রকার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন হলোঃ আলোচনাধীন দুটি মতাদর্শের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য? কোন্‌টি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা এবং কোন্‌টি ইসলামের নামে রক্তপাতের লাইসেন্স? কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য নিছক মিথ্যাচার? আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে বর্তমান যুগে চতুর্দিকে সংঘটিত ক্রম–বর্ধমান সহিংসতামূলক কর্ম–কান্ড এবং ধর্মের নামে জঙ্গীবাদী মতাদর্শের অপ–প্রচার থেকে মানব–জাতিকে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী সকল শান্তিবাদী মানুষ এবং সত্য–সন্ধানীদের প্রতি রইলো উদাত্ত আহ্বান।

[চলবে]

ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

কুরআন করীমে কুরবানীর পটভূমি

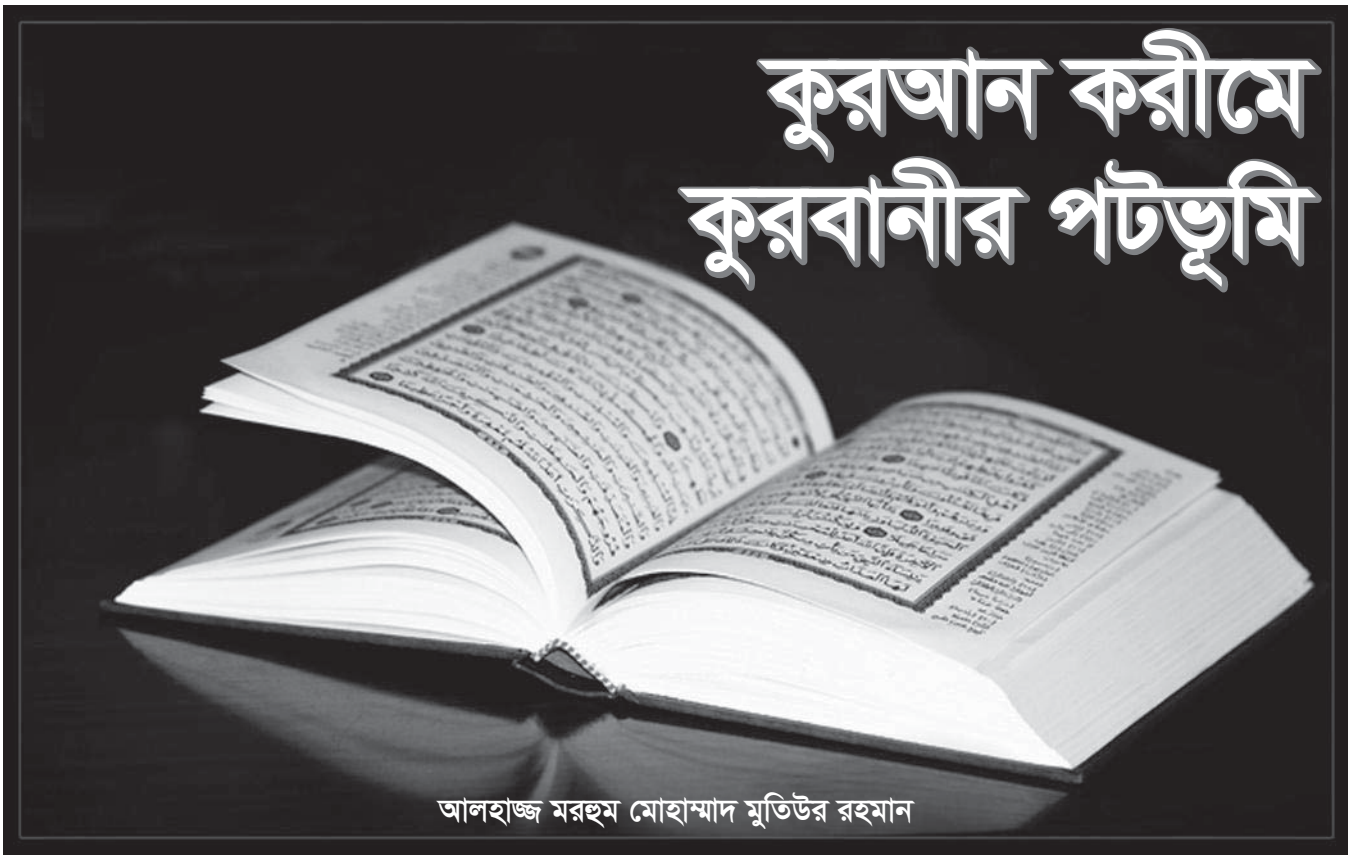

আলহাজ্জ মরহুম মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "এরপর সেই পুত্র (অর্থাৎ ইসমাঈল) যখন তার সাথে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হলো, তখন সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। অতএব তুমি চিন্তা কর, 'তোমার কি অভিমত?'সে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি যে আদেশ পেয়েছ, তা-ই কর,ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মাঝে (দেখতে) পাবে।'

এরপর তারা যখন উভয়েই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে জবাই করার জন্যে কপালের ওপর উপুর করে শোয়ালো, তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছো।' আমরা এরূপেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

নিশ্চয় এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

আর আমরা এক মহান কুরবানীর দ্বারা এ ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দিয়েছিলাম।

আর আমরা পরবর্তীগণের মাঝে তাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করলাম। ইবরাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

এরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।" (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১০৩-১১২)।

কুরবানী সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া সাল্লামের কয়েকটি হাদীস:

* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! (জেনে রাখ) প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবূ দাউদ ও নাসাঈ)।

* মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ঈদ গাহের কাছে না আসে (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ঈদে ধুসর রংঙ্গের শিংওয়ালা ২টি দুম্বা কুরবানী করলেন। তিনি সেগুলোকে নিজ হাতে জবাই করলেন এবং (জবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন।

রাবী (রাহ.) বলেন, (জবাই করার সময় আমি) আমি তাঁকে ওগুলোর পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে এবং বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি। (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

* হযরত উকবা ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর মাংস বন্টন করার জন্যে তাকে [অর্থাৎ উকবা (রা.)] কতগুলো ছাগল ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর এক বছরের একটি বাচ্চা ছাগল বাকী থাকলো। তিনি (রা.) সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর (সা.) বল্লেন, এটা তুমি কুরবানী কর। আর এক বর্ণনা মতে, আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ভাগে তো একটি বাচ্চা ছাগল থাকলো। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি এটাই কুরবানী কর (মুত্তাফাকুন আলায়হে)।

* হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই জবাই করতেন বা নহর

করতেন (বুখারী)।

* হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট ৭ জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী) করা যেতে পারে (মুসলিম ও আবূ দাউদ)।

* হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক যখন আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (অর্থাৎ না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে সে যেন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখগুলোর কিছু না কাটে (মুসলিম)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ, কান ভালভাবে দেখে নেই। যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গিয়েছে অথবা যার কান গোলাকার ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান পেছনের দিক থেকে ফেরে গিয়েছে তা দিয়ে আমরা যেন কুরবানী না করি (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নিসাঈ ও দারিমী)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দিয়ে আমাদেরকে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিংওয়ালা খুব বলবান দুম্বা দিয়ে কুরবানী করতেন যার চোখ কাল, মুখ কাল, এবং পা কাল (আরবে এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়) (তিরিমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্)।

* বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে' (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ছয় মাস বয়সের ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে (আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ১০ বছর অবস্থান করেছেন এবং বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

* হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ কুরবানী কী? হুযূর (সা.) উত্তর দিলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত (রীতি)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কি (পুণ্য) আছে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল? হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের জন্যে একটি পুণ্য আছে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পশমওয়ালা পশুর পরিবর্তে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশি)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ, ইবনে মাজাহ্)।

ফিকাহ্ আহমদীয়ার প্রতি এক নজর

"সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী সুন্নতে মুয়াকিদা ও ওয়াজিব (ইবনে মাজাহ্, পৃষ্ঠা ২২৬, তিরমিযী আবওয়াবুল আযহিয়া পৃষ্ঠা ১৮১)। এতে একটি হিকমত ও প্রজ্ঞা এই, কুরবানী দাতা ইঙ্গিতের ভাষায় একথা স্বীকার করে, যেভাবে এ নিম্নস্তরের পশুটি আমার জন্যে উৎসর্গীকৃত হচ্ছে সেভাবে উচ্চ স্তরের সত্তার উদ্দেশ্যে আমার জীবনকে উৎসর্গ করতে হলো আমি সন্তুষ্টচিত্তে উৎসর্গ করবো। মোট কথা কুরবানী একটি প্রতীকী ভাষা। এর তাৎপর্য হলো এই, যিনি পশু জবাই করেন তিনি নিজের সত্তাকে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত আছেন।

কুরবানীর জন্য উট, গুরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা থেকে যে কোন পশু জবাই করা যেতে পারে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া যথেষ্ট। আর মানুষ কুরবানী করার নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কমপক্ষে উট ৩ বছরের, গরু ২ বছরের, ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক বছর বয়সের হতে হবে। দুম্বা যদি মোটা তাজা হয় তাহলে ৬ মাসের বয়সের টিতেও কুরবানী বৈধ হবে। কুরবানীর পশু দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। লেংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা এবং অন্ধ পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। এভাবে রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ পশুকেও কুরবানী করা বৈধ নয়।

কুরবানীর সময় হলো ১০ই যিলহাজ্জ ঈদের নামাযের পর থেকে আরম্ভ করে ১২ই যিলহাজ্জ সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত। কুবানীর মাংস সদকা নয়। অতএব কুরবানীদাতা এ মাংস নিজেও খেতে পারেন এবং আত্মীয়স্বজনও খেতে পারেন। এথেকে গরীবদের অংশ দেয়া উচিত। তিন ভাগ করাই উত্তম। এক ভাগ নিজেদের এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের এবং এক ভাগ গরীবদের মাঝে বন্টন করা হয়" (ফিকাহ্ আহমদীয়া থেকে পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৩)।

কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য

আজ থেকে থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহ্‌র এক নবী ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)। অতি বৃদ্ধ বয়সে জন্ম নিয়েছে একটি ছেলে। এ ছেলে আল্লাহ্‌র মহাদান। তাই খুবই আদরের। নাম তার ইসমাঈল। তিনি যখন তাঁর পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলেন তখন আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন। একথা আমরা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত থেকে জানতে পারি। আল্লাহ্ তাঁকে (আ.) ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছো। তিনি ছেলেকে জবাই করলেন না অথচ কিভাবে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন এ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রথম কথা হলো, ধর্মের নামে নরবলি দেয়ার প্রথা বহু আগ থেকে চলে আসছিল। আল্লাহ্ তা'লা রক্ত- পিপাসু নন যে তাঁর প্রিয় সৃষ্টির রক্তে তিনি তুষ্ট হবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নের নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী সন্তান কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা নরবলি প্রথাকে চিরতরে রহিত করার জন্য এ জবাই হতে দিলেন না। পরে ইব্রাহীম

(আ.) আল্লাহ্‌র আদেশে পশু জবাই করলেন। নরবলি পশু বলিতে রূপান্তরিত হলো।

দ্বিতীয়ত হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর এক-অদ্বিতীয় (বাইবেলে আছে, হযরত ইব্রাহীম তাঁর এক- অদ্বিতীয় পুত্র ইসহাককে কুরবানী করছিলেন। হযরত ইসমাঈল প্রথম সন্তান তাই যতদিন ইসহাক জন্মগহণ করেন নি হযরত ইসমাঈলই এক-অদ্বিতীয় সন্তান ছিলেন এবং ইসমাঈলকেই কুরবানী করা হয়েছিল। এখানে বাইবেল ভুল শিক্ষা দিচ্ছে) পুত্র ইসমাইলকে শিশু বয়সেই আল্লাহ্ তা'লার আদেশে মক্কার নিবিড় অরণ্যে তাঁর মাতা হযরত হাযেরা সহ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সেখানে আল্লাহ্‌র পবিত্র ও প্রাচীন কা'বা ঘরের সংস্কার হলো এবং মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হলো। আর সেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে আবির্ভূত হলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এ মহান পরিকল্পনাকে দৃষ্টিপটে রেখে মহান আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে তাঁর কাছ থেকে কুরবানী গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে দুনিয়ার সামনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে এ আদেশ দিলেন আর অমনি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ***আসলামতুলি রাব্বিল আলামীন*** বলে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান কুরবানীর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হলো দুনিয়াতে। পিতামাতা কর্তৃক অতি আদরের দুলাল দুলালীকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দেয়ার প্রথা চালু হলো। এরই অনুকরণে আজ আমরা দেখি আহমদী জামাআতে ওয়াকফে জিন্দেগী ও ওয়াকেফীনে নও স্কীমের অধীনে সন্তানদের কুরবানী করতে। এ কুরবানী মরার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি জাতি গোষ্ঠীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এ কুরবানীর আত্মা এবং শক্তি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর (সা.) উম্মতকে পশু কুরবানীর আদেশ দিলেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমান প্রত্যেক বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আ.) যেভাবে পিতার ছুরির নিচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কুরবানীর পশু যেভাবে ছুরির নিচে মাথা পেতে দেয় তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের এ প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক যেন ধর্মের খাতিরে ইসলামের পথে তারা নিজেদের এ ভাবে কুরবানী করে দিতে পারে। আবার কুরবানীর পশুর মত নিজেদের পশুত্বকে বলি দেয়ার শিক্ষাও আমরা কুরবানী থেকে পেয়ে থাকি। কেবল গোশ্‌ত খাওয়াই এ কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। আর এতে আল্লাহ্‌রও কোন উপকার নেই। আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন–***লা ইয়ানা লাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিআউহা ওয়া লাকিইঁয়ানালাহু তাক্‌ওয়া মিনহুম*** অর্থাৎ ওগুলোর মাংস বা ওদের রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের পক্ষ থেকে তাক্‌ওয়া পৌঁছে (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)। সুতরাং ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুযায়ী নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে কুরবানী পালনের মাধ্যমে প্রতি বছর মুসলিম নিজের মাঝে তাক্‌ওয়াকে আর একবার ঝালিয়ে নেন যেন প্রয়োজনের দিনে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর পশুর ন্যায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

প্রসঙ্গত কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য না বুঝার কারণে কেউ কেউ কটূক্তি করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরবানী একদিকে যেমন অপচয় অর্থাৎ একদিনে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ পশু জবাই করে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের ঘাটতি সৃষ্টি করা হচ্ছে অন্যদিকে একটা অবোধ পশুকে আল্লাহ্‌র নামে নৃশংসভাবে হত্যা (!) করার ফলে আর একজনের পুণ্যের হাড়ি ভরতি হচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত উক্তি সঠিক বলে মনে হলেও গভীর দৃষ্টিতে

কুরবানীর জন্য উট, গুরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা থেকে যে কোন পশু জবাই করা যেতে পারে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া যথেষ্ট। আর মানুষ কুরবানী করার নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কমপক্ষে উট ৩ বছরের, গরু ২ বছরের, ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক বছর বয়সের হতে হবে। দুম্বা যদি মোটা তাজা হয় তাহলে ৬ মাসের বয়সের টিতেও কুরবানী বৈধ হবে। কুরবানীর পশু দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। লেংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা এবং অন্ধ পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। এভাবে রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ পশুকেও কুরবানী করা বৈধ নয়।

পর্যবেক্ষণ করলে এটা বোকার উক্তি বলে প্রতীয়মান হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আল্লাহ্ তা'লা যেসব বস্তু হালাল (বৈধ) করেছেন এর মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে বরকত ও প্রবৃদ্ধি রেখে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই গরু ছাগল প্রভৃতির বাচ্চা উৎপাদনের হার কুকুর শূকর ইত্যাদির চেয়ে কম–বারেও আর সংখ্যায়ও। কুরবানী এবং মাংস নিষেধ দিবস (Meat less day) ছাড়াও প্রতিদিন বিশ্বে লক্ষ লক্ষ গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই হচ্ছে। তবুও আমরা দেখতে পাই পশু পালকের পালন নিঃশেষ হয় না। অথচ বহুগুণে কুকুর শূকর পয়দা হলেও (মুসলমানের জন্য এগুলো যদিও নিষিদ্ধ) এদের সংখ্যা তুলনামূলক কমই দেখা যায়। রাস্তা ঘাট তো কুকুর শূকর প্রভৃতিতে ভরতি থাকার কথা। যেভাবে গুরু ছাগল প্রভৃতি খাওয়া হয় আল্লাহ্ যদি এগুলোতে বরকত না দিতেন তাহলে এ প্রজাতিগুলো বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিত কেননা এদের খাবার সংকট দেখা দিত।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই 'বড়'র বাঁচার জন্য 'ছোট' সব সময় প্রাণ দিচ্ছে। ছোট মাছ বড় মাছের জন্য জীবন দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশু ছোট ছোট নীরিহ প্রাণী খেয়ে বেঁচে আছে। যারা অতি দরদ দেখিয়ে গুরু ছাগল জবাই করার ব্যাপারে কটূক্তি করেন তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, জীব হত্যা করতে পারবেন না, একথা পালন করলে তারা কি বাঁচবেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, গাছ লতা-পাতা এদের সবার প্রাণ আছে। এদের ওপর আমরা সবাই নির্ভরশীল। তাদের সাথে অসংখ্য জীবাণু আত্মবলি দিচ্ছে। এ কি তাদের জানা আছে। প্রকৃত কথা এই, ক্ষুদ্র'র আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বৃহৎ'-এর জীবন আর এর মাঝেই ক্ষুদ্রের জীবনের সার্থকতা রেখে দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার সেবায় জীব-জন্তু বৃক্ষ তরুলতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নিয়োজিত এদের কুরবানীতে মানব জীবন বাঁচে এবং এদের জীবন হয় সার্থক। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এদের সৃষ্টি করেছেন। তবে এদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে আমরা তা যেন ভুলে না যাই। অতএব প্রকৃতির মাঝে কুরবানী ও ত্যাগের মহিমাই যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ভাবেই আল্লাহ্ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কুরআন হাদীস এবং বুযুর্গানে দীনের ভাষ্য থেকে যতটুকু জানা যায় কুরবানীর পেছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করা আবশ্যক তা হলো তাক্ওয়া বা খোদার সন্তুষ্টি। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যে কুরবানীর পেছনে এ উদ্দেশ্য ও আত্মা কাজ করে না সে কুরবানী, কুরবানীর আওতায় পড়ে না। আমরা অনেক সময় দেখি নাম ফলানোর জন্য বা লোক দেখানো ভাব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কুরবানী করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে গরুর একটা 'রান' অমুক বেয়াইর বাড়ীতে, অমুকটা অমুক সাহেবকে দিতে হবে ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় দেখেছি সেই 'রান'টা খুব সাজিয়ে ঢোল বাদ্য সহকারে যথাস্থানে পাঠানো হয়। এটা ঢাকার পয়সাওয়ালা লোকদের মাঝেই বেশি দেখা যায়। আল্লাহ্‌র কাছে এ কতটা গ্রহণীয় তা তিনিই ভাল জানেন।

সামর্থ্য ও বিত্ত বানরাই কুরবানী দিয়ে থাকেন। লক্ষ থাকে যেন ফ্রিজ ভরে রাখতে পারেন এবং অনেক দিন ধরে কুরবানীর মাংস খেতে পারেন। এমনও বলতে শুনা গেছে, এতে নাকি সওয়াব বেশি। গরীবদের ২/১ টুকরা দিয়ে ফ্রিজ ভরে রাখার প্রবণতা গৃহীণিদেরই একটু বেশি। কিন্তু এটা উচিত নয়। যে গরীব জন গোষ্ঠী সারা বছর তেমন মাংস খেতে পারে না সেই দরিদ্র গোষ্ঠী কুরবানীর সময় একটু বেশি করে মাংস খেয়ে সারা বছরের প্রোটিনের অভাব কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারবে কুরবানীর এটা একটি বড় উদ্দেশ্য। সামর্থ্যবানগণ তো প্রত্যেক দিনই মাংস খেয়ে থাকেন। কুরবানীর মাংসের মূল্য সাধারণ সময়ের মূল্যের চেয়ে বেশ একটু বেশিই হয়ে থাকে। সুতরাং বেশি দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভরতি না করে আগে কম দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভরতি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আর গরীবদের একটু মাংস বেশি দিয়ে পুণ্যের খাতায় পুণ্য বেশি লেখানো কি বোকামীর কাজ হবে?

মাংস বন্টনের ব্যাপারে জামাআতে আহমদীয়াতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা, এখানে রয়েছে খিলাফতের নেযাম। যারা কুরবানী করেন তারা এক তৃতীয়াংশ মাংস জামাআতের ব্যবস্থাপনার কাছে জমা করে দেন। যারা কুরবানী দিতে পারেন না জামা'ত আগেই তাদের তালিকা তৈরী করে রাখে আর যথারীতি মাংস বন্টন করে সম্ভব হলে বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেয়া হয়। কোন আহমদীকে মাংস সংগ্রহ করতে বাড়ী বাড়ী যেতে হয় না। কি সুন্দর ঐশী ব্যবস্থা! খিলাফত আছে বিধায় এ সুন্দর ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তা'লা একে চিরস্থায়ী করুন!

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

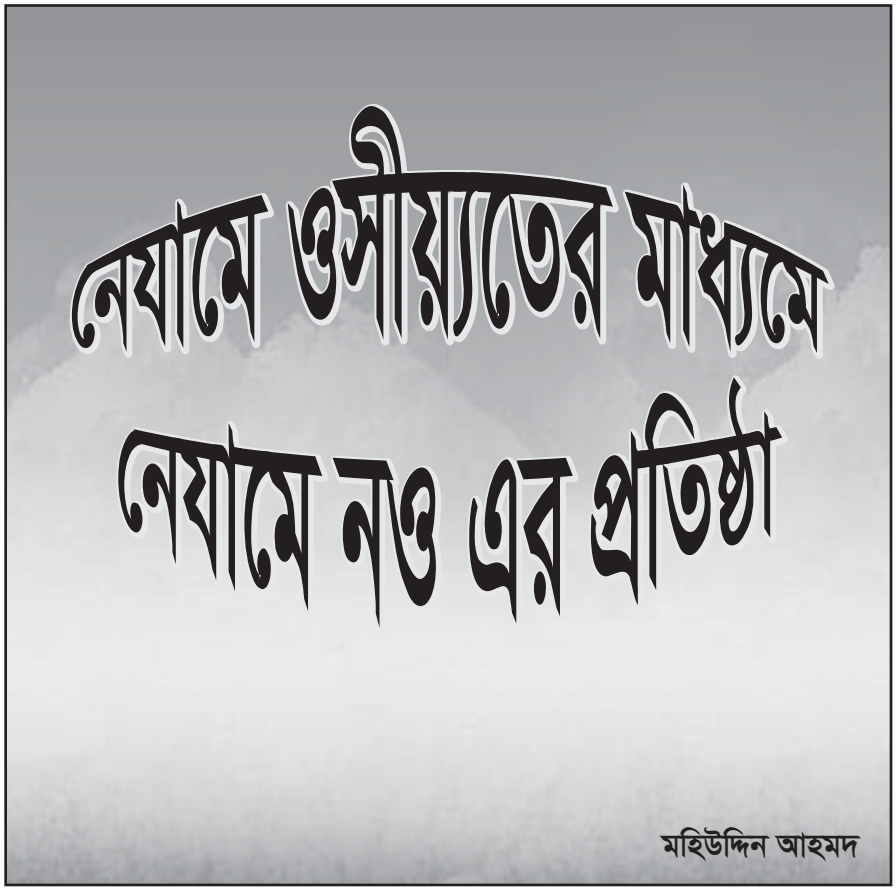

মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ এলহামের আলোকে প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৯০৫ইং সনে নেযামে ওসীয়্যত তাহরীক ঘোষণা করেন।

নিজের মৃত্যু সম্পর্কিত পুনঃ পুনঃ এলহাম প্রাপ্তি ও তার প্রেক্ষিতে নিজ কবরস্থান সম্পর্কে এলহামী বর্ণনার পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার রচিত পুস্তক আল ওসীয়্যতে এ লিখেন ঃ

"আরো একটি স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে এবং সেই স্থানের নাম রাখা হয়েছে 'বেহেশতী মাকবেরা' এবং প্রকাশ করা হয়েছে যে উহা জামা'তের সেসব মনোনীত ব্যক্তিগণের সমাধি ক্ষেত্র যারা বেহেশতী।"

পুণরায় তিনি লিখেন, "আমি দোয়া করছি, খোদা যেন এতে বরকত দান করেন, এবং এটাকেই বেহেশতী মাকবেরাতে পরিণত করেন। জামা'তের সেসব পবিত্র আত্মা ব্যক্তিগণের যেন এটা নিদ্রাস্থান হয়, যারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর সব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, সংসার প্রেম পরিহার করেছেন ও খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে এক নেক পরিবর্তণ সাধন করে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্থতা ও সত্য নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।"

"আবার আমি দোয়া করছি, 'হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা এই ভূমিখন্ডকে আমার জামা'তের সেই সব পবিত্র চিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর, যারা প্রকৃতই তোমার হয়ে গেছেন এবং যাদের কাজ-কর্মে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নেই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

"পুণরায় আমি তৃতীয় বার দোয়া করছি, 'হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু খোদা, হে ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় খোদা, তুমি শুধু সেসব লোককে এখানে কবরের জায়গা দান কর যারা তোমার এই প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা ও অন্যায় সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ করেন না এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবী সমূহ পূরণ করে থাকেন এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সাথে জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাদের সম্বন্ধে তুমি জানো যে তারা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হয়ে গেছেন এবং তোমার প্রেরিত জনের সাথে বিশ্বস্ততা, পূর্ণ শিষ্ঠাচার ও অকপট বিশ্বাসের সাথে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।"

বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত হওয়ার জন্য এই শর্ত রাখেন যে, "শুধু তিনিই সমাহিত হবেন, যিনি এই ওসীয়্যত করবেন যে, তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক দশমাংশ এই সিলসিলার নির্দেশক্রমে ইসলামের বিস্তার ও কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় হবে। প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার ওসীয়্যত এর চেয়েও অধিক লিখে দিতে পারবেন কিন্তু এর চেয়ে কম হবে না।" সেই সাথে তৃতীয় শর্তে উল্লেখ করেন, "এই কবরস্থানে যারা সমাহিত হবেন, তারা হবেন মুত্তাকী, সর্ব প্রকার হারাম হবে আত্ম রক্ষাকারী, কোন প্রকার শিরক্ ও বেদাতের কাজ করবেন না এবং খাঁটি ও পরিচ্ছন্ন মুসলমান হবেন।"

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ আলিফ লা-ম মী-ম। আ হাসিবান্নাসু আঁই ইয়ুতরাকূ আঁই ইয়াকূলূ আমান্না ওয়া হুম লা ইয়ুফতানূন। অর্থাৎ লোকেরা কি একথা ভেবেছে যে, আমি এতেই সন্তুষ্ট হবো যে, তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। (সুরা আনকাবুতঃ ২ ও ৩) "এই পরীক্ষা তো কিছুই না। সাহাবাদের পরীক্ষা তাদের প্রাণ চাওয়ার মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং তারা নিজেদের মস্তক খোদার পথে দান করেছিলেন।"

"আমি নিজে অনুভব করছি যে, এখনকার পরীক্ষা দ্বারাও উন্নত শ্রেণির মুখলেস (খাঁটি বিশ্বাসী) ব্যক্তিরা যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে সকল পার্থিব বিষয়ের ওপর শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেন, তারা অন্যান্য লোক থেকে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন এবং এটা প্রমাণিত হবে যে, বয়আতের প্রতিজ্ঞাকে তারা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং নিজ সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা মুনাফিকদের কাছে কঠিন বলে মনে হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রী লোক এই কবর স্থানে কখনও সমাহিত হতে পারবে না।"

ঐশী নির্দেশে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত ওসীয়্যত ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। এ

সম্পর্কে সর্বপ্রথম মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৪২ইং সনের সালানা জলসা বক্তৃতায় বিস্তারিত বর্ণনা করেন। লেকচারটি পরবর্তীতে "নেযামে নও" নামে পুস্তকারে প্রকাশিত হয়।

সমাজের মানুষের বিশেষত গরীবদের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র কল্যাণ মূলক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রূপ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে আছে, তাদের যথাযথ পোষাক বা বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই। এমনকি তথাকথিত পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলোও এখন পর্যন্ত সবার জন্য খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। সেই সাথে ঐ সমস্ত দেশ গুলোতে যোগ হয়েছে মাদকাসক্তি, সমকামিতা, অবাধ যৌনাচার, বস্তুতান্ত্রিক ভোগ বিলাসিতা, নাস্তিকতা ও উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন। প্রযুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নেও ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য কমার পরিবর্তে বরং বর্তমানে তা সীমাহীন বৈষম্যে রূপ নিয়েছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর উক্ত সালানা জলসা লেকচারে সমাজের মঙ্গল ও দারিদ্র দূরীকরণে এবং মানুষে মানুষে ব্যাপক অর্থনৈতিক অসমতা মিটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হওয়া বিবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাদের ভাল-মন্দ উভয় দিক তুলে ধরেন। দারিদ্র দূরীকরণে ও সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রধান ধর্মগুলোর বিধান সমূহও পর্যালোচনা করেন। উক্ত লেকচারের একটি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং অসম্পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ ২য় ও মুসলেহ মাওউদ (রা.) উল্লেখ করেন পৃথিবীতে বর্তমানে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়ে চলেছে। আগে কর্মচারী/ খাদেমদেরকে পরিবারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হতো, বর্তমানে তারা শ্রমজীবী মাত্র। তাছাড়া শিক্ষা ও দর্শনের ব্যাপক বিস্তারের ফলে দারিদ্রের অনুভূতিও তীব্রতর হয়েছে। বর্তমানে মনে করা হয় একজন দরিদ্র ব্যক্তি ক্ষুধার্ত, তার অর্থ এই নয় যে সৃষ্টিকর্তা তাকে ক্ষুধার্ত রেখেছেন বরং সমাজের ধনী ক্ষমতাশালী অংশ জোর পূর্বক ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে। আগে একজন গরিব মানুষ তার অবস্থার জন্য তকদীরকে দায়ী করতো, বর্তমানে দায়ী করছে সমাজ ব্যবস্থা ও পুঁজিপতিদের। বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার ও কল কারখানার প্রতিষ্ঠা ধনী দরিদ্রের ব্যবধান আরও প্রকট করে তুলেছে। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন যুগে কিছু কিছু চিন্তাবিদ, রাজা-বাদশাহ বা জমিদার গরিবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন, যা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল সীমাবদ্ধ, ত্রুটিপূর্ণ, আঞ্চলিক ও অস্থায়ী।

বিগত কয়েক শতাব্দীর জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলনে আধুনিক সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়, যা আংশিকভাবে জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়। কল কারখানার প্রসারের সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। মূলতঃ উক্ত শ্রমিক শ্রেণির ক্রমাগত সোচ্চার প্রতিবাদে সোশালিজম আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তীতে প্রসারিত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল সোশালিজমে রূপ নেয়।

অতঃপর জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস্ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, সোশালিজম এর মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার শত শত বৎসরেও প্রতিষ্ঠা হবে না। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। পরস্পর স্বার্থবিরোধী ধনী দরিদ্রের মধ্যে ঐক্য হতে পারে না। সুতরাং সংগঠন তৈরি করতে হবে, আক্রমণ করতে হবে ও ক্ষমতা দখল করতে হবে। লেলিন ও অনুরূপ নেতাদের প্রচারণায় রাশিয়ায় মার্কস্ইজম (কম্যুনিজম) ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। বেশির ভাগ সমর্থন লাভকারী অংশটি বলশেভিক ও অপর অংশটি মেনশেভিক রূপে পরিচিত লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অজনপ্রিয় জার দ্বিতীয় নিকোলাস এর পতন ঘটে। প্রথমে মেনশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে। অতঃপর তাদেরকে হটিয়ে বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে (এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়া বা ইউ.এস.এস.আর. রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়)। মার্কসবাদ লেলিনবাদ (বলশেভিজম) মতে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে আনতে হবে, অপর পক্ষে যার যেমন প্রয়োজন অনুরূপ মজুরি বা দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করতে হবে। উদ্বৃত্ত সম্পদ রাষ্ট্রের, শ্রমজীবী (হাতে কাজ করা জনগণ) অংশকে তার প্রাপ্য দিতে হবে, রাষ্ট্রের বৃহত্তর পরিকল্পনা মোতাবেক উৎপাদন প্রক্রিয়া চলবে। ধর্মের যাজকগণ যেহেতু হাতে কাজ করে না সেহেতু তাদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের কোন দায় দায়িত্ব নাই। এই শেষোক্ত নীতির কারণে বলশেভিক (কম্যুনিষ্ট) রাষ্ট্রে নাস্তিকতা বিস্তার লাভ করে। ছেলে মেয়েরা যখন রাষ্ট্রের নিগরানীতে ১৮/২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত নাস্তিকতা ধারণায় শিক্ষা লাভ করে, পরবর্তী বয়সেও তারা নাস্তিকতার ধারক বাহকই থেকে যায়। তাছাড়া মার্কস্বাদ-লেলিনবাদ (বলশেভিজম) তাদের মতাদর্শ পৃথিবীব্যাপী প্রচারেও বিশ্বাসী।

ইউরোপে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের অবস্থা) মার্কস্বাদ-লেলিনবাদ (বলশেভিজম) প্রতিহত করার জন্য জার্মানী ও ইটালিতে নাৎসিজম ও ফ্যাসিজম আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন অনুসারে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য বড় বড় ব্যবসায়, বড় বড় কলকারখানা প্রয়োজন আছে। তবে রাষ্ট্র এই সমস্তের ওপর এক ধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের মধ্যে লাভের অংশ খরচ করবে। ফলে সবাই সামগ্রিক ভাবে লাভবান হবে। নাৎসিজম জাতিগত উৎকষ্টতার বাহানায় সবার ওপর কর্তৃত্ব করারও দাবিদার হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে নিজস্বতার ওপর জোর দেওয়া হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও অপরের ওপর প্রভুত্ব করার লিপ্সা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে। (পরিশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের মাধ্যমে নাৎসিজম ও ফ্যাসিজমের বিলুপ্তি ঘটে।)

অপর পক্ষে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকায় (ইউ.এস.এ) পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ক্রমান্বয়ে আংশিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা গ্রহণ করে, ফলে শ্রমিক শ্রেণি আগের চেয়ে অধিকতর অধিকার লাভ করতে থাকে। আগে থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতি থাকায়, এই সমস্ত দেশে শ্রমিক শ্রেণি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। যদিও এই শাসন ব্যবস্থা গোপন সাম্রাজ্যবাদেরই প্রকান্তর। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র সরাসরি জড়িত হয় না।

বলশেভিজম-কম্যুনিজম (মার্কস্বাদ-লেলিনবাদ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র ও কাজ কর্মে ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্দীপনা রোধ করে, ফলে সামগ্রিক জাতীয় উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়। তাছাড়া জোর জবরদস্তির মাধ্যমে সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে সমাজের উল্লেখ যোগ্য অংশ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় না। ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান করে না। অপর পক্ষে একনায়কত্বে উৎসাহ প্রদান করে। গবেষণা

ও বুদ্ধিচর্চায় প্রেরণার অভাব অভাব থাকে। অবস্থাপন্নদের নির্যাতন শুরু হয়। বলশেভিক (মার্কসবাদ -লেনিনবাদ) নেতৃত্বে কোন কারণে অবনতি হলে, নয়া নেতৃত্বের বদলে পুরা প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

গরীব অসহায়দের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন ধর্মে বর্ণিত বিধান গুলিও আলোচনা করা যেতে পারে। ইহুদী ধর্ম মতে শুধুমাত্র ইহুদী ধর্মাবলম্বীদেরকেই অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি বিন্দুমাত্র সাহনুভূতি নাই বরং তাদেরকে দাস হিসাবে রাখার বিধান রয়েছে। অধিকন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে কতল করারও হুকুম রয়েছে। অপর পক্ষে খ্রিস্টীয় মতে শরীয়ত বা সব বিধিবিধানই লানত----- সুতরাং খ্রিস্টীয় ধর্মমতে দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য নিজস্ব কোন পরিকল্পনাই নাই। হিন্দু ধর্মমতে সব কিছুই পূর্ব জন্মের পাপ-পূন্যের ফলাফল। সুতরাং যে দরিদ্র তা তার পূর্ব জন্মের কৃত কাজের ফল, যা তাকে ভোগ করতেই হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পেতে পারে না।

হিন্দু ধর্মমতে অন্য ধর্মের লোককে শুদ্র শ্রেণিভুক্ত বিবেচনা করা হয়। যাদের কোন অধিকারই নাই না টাকা পয়সার, না সহায় - সম্পত্তির। অপর পক্ষে ইসলাম সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য বিভিন্ন মুখী পথ নির্ধারণ করেছে সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে সাম্প্রতিক কালে দাস মুক্তির আগ পর্যন্ত সমাজে সবচেয়ে বঞ্চিত নির্যাতিত অংশ ছিল দাস শ্রেণি। ইসলাম প্রথমেই দাস সৃষ্টির যাবতীয় উপায় নিষিদ্ধ------করে শুধুমাত্র নিয়মিত প্রতিরোধী যুদ্ধ ছাড়া। সে ক্ষেত্রেও দাস মুক্তির বিভিন্ন মুখী পন্থা বিধিবদ্ধ করেছে। এছাড়াও দাস মুক্তিকে উৎসাহ দেয়া হয় ও অত্যন্ত সওয়ার বা পূণ্যের কাজ হিসাবে নির্ধারিত করা হয়। দরিদ্রের কষ্ট দূর করার জন্য ও সম্পদ যাতে মুষ্ঠিমেয় লোকের হাতে জমা না হলে পারে সেজন্য ইসলামে চার ধরনের/ রকমের বিধান রাখা হয়েছে। যেমন উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পদ (বন্টন হওয়া কোন ধর্মে শুধু বড় ছেলে, কোন ধর্মে শুধু পুত্রদিগকে উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে), অর্থ-কড়ি বেশুমার জমা রাখতে বাধা দান করা, সুদ নিষিদ্ধ করা, যাকাত-সাদকা ইত্যাদি প্রদান করা।

এসব সত্বেও ইসলাম সম্পত্তির ওপর ব্যক্তি মালিকানার হক বজায় রেখেছে। দারিদ্র দূরীকরণে ইসলামের বিধান মার্কস্‌বাদ লেলিনবাদ বা কম্যুনিজম এর চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য, কেননা তা শান্তি, ন্যায় বিচার ও ক্রম উন্নতির ওপর নির্ভর করে। কায়িক পরিশ্রমের দিকে জোর দিতে গিয়ে কম্যুনিজম (বলশেভিজম) বুদ্ধি-বৃত্তিক যোগ্যতাকে খাটো করে দেখে। তারপরেও কম্যুনিজম সর্বস্তরে সমতা বিধান করতে পারে নাই। পার্টি লিডার ও সাধারণ জনতার ভিতর আকাশ-পাতাল প্রভেদ থেকেই যায়। মেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন দেখে যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন নাই, তখন যারই পক্ষে সম্ভব দেশ ত্যাগ করার চেষ্টা করে, ফলে ব্যাপক হারে মেধা পাচার হয়।

গরিব জনসাধারণের সব রকম প্রয়োজন মিটানোর জন্য, আধুনিক সমাজের বিভিন্নমুখী চাহিদা মিটানোর জন্য, সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের আধিপত্য প্রয়োজন, শুধুমাত্র যাকাত আদায় দ্বারা বর্তমানের সব রকমের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়।

সোশালিজম, শ্রমজীবীদের কল কারখানা ব্যবসায়ের লাভের অংশ দেখার পক্ষপাতী। কিন্তু এতেও সম বন্টন সম্ভব নয়। সোশালিজম আদর্শ মোতাবেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান যেমন রেল, ডাক, বিদ্যুৎ,পানি সরবরাহ ইত্যাদি সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীদের মনোপলি সীমিত রাখার নীতি অনুসরণ করা হয়।

বলশেভিজম (কম্যুনিজম) সব সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করে গরিব ও সাধারণ জনগণের অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করে, কিন্তু সেই সাথে ব্যক্তি কেন্দ্রিক চেষ্টা প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণাকে বাধা গ্রস্ত করে ফলে নতুন নতুন সম্পদ ও সম্ভাবনা সৃষ্টির উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট হয়। সার্বিক ফলাফলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'ইসলামে সাম্যতা প্রতিষ্ঠার আরেকটি পন্থা হল বিলাস সামগ্রী নিষিদ্ধ করা। আধুনিক সমাজে বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করা, ভোগ করা ও জমা রাখার একটি প্রতিযোগীতা আছে। আর ইসলামের বিধান অপ্রয়োজনীয় ঝাঁকজমক বা বিলাস দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করা। ফলে ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রে কম সম্পদেও সবাইকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা অধিকতর সহজ।'

'ইসলামে ব্যক্তি কেন্দ্রিক চেষ্টা প্রচেষ্টা কে জায়েজ রাখায় প্রতিটি ব্যক্তি তার স্ব স্ব পেশা বা কাজে সর্বোচ্চ কর্ম কুশলতা দেখানোর অনুপ্রেরণা লাভ করে, ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজ রাষ্ট্র লাভবান হয় ও উন্নতি লাভ করে।'

সমাজের মানুষের বিশেষত গরীবদের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র কল্যাণ মূলক সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রূপ নিয়েছে। তা সত্ত্বেও আজও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে আছে, তাদের যথাযথ পোষাক বা বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই। এমনকি তথাকথিত পাশ্চাত্য ধনী দেশগুলোও এখন পর্যন্ত সবার জন্য খাদ্য বাসস্থান চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) গরিবদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর শাসনামলে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খাদ্য কাপড়ের নির্দিষ্ট বরাদ্দ ছিল, এসব ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রেজিষ্টার রাখা হতো। অর্থাৎ খেলাফতের যুগে দারিদ্র দূরীকরণের ও সমতা বিধানের ব্যবস্থাদী আরও সুসমন্বিত ও সুবিস্তৃত হয়। সুতরাং ইসলামের অর্থনৈতিক নিয়ম মোতাবেক মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে হবে, সেই সাথে ব্যক্তিগত

যোগ্যতাকেও মূল্যায়ন করতে হেব। ধনীদের কাছ থেকে জবরদস্তি মূলক নয় বরং তাদেরকে প্রেরণা দিতে হবে যেন তারা স্বেচ্ছায় আরও সম্পদ প্রদান করে।

১৯০৫ইং সালে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) ইসলাম প্রচার ও দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট মিটাবার জন্য ওসীয়্যত ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়া নেযামের বুনয়াদ রাখেন। নেযামে ওসীয়্যতেরই একটি ছোট নকশা তাহরীকে জাদীদ। তাহরীকে জাদীদের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সম্পদ এর সৃষ্টি হবে যা দ্বারা বিশ্বে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করবে, ফলে তবলিগের মাধ্যমে ওসীয়্যত ব্যবস্থাও আরও বিস্তৃতি লাভ করবে। তাহরীকে জাদীদ নেযামে নও এর সূচনা স্বরূপ।

ওসীয়্যত ব্যবস্থার মাধ্যমে ১/৩ অংশ থেকে ১/১০ অংশ সম্পত্তি জমাতের অধিকারে আসতে থাকবে। আহমদী জামা'তের প্রচার বৃদ্ধির সাথে সাথে সারা দুনিয়া ব্যাপী সম্পত্তি ওসীয়্যত হতে থাকবে। ফলে কয়েক পুরুষের ভিতর বিশ্বের অধিকাংশ সম্পত্তির ওপর জামা'তের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে আহমদী জামা'ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরিব, দুঃখী, অসুস্থ,এতিমসহ সমাজের সবার প্রয়োজন যথাযথ ভাবে পূরণ করতে সক্ষম হবে।

পুঁজিবাদ দরিদ্রের অধিকার অস্বীকার করে। সমাজতন্ত্র আংশিক সংশোধন নিয়ে অগ্রসর হয়। কম্যুনিজম অবস্থাপন্নদের দুর্দশার ভিতর ফেলে, সৃষ্টিশীলতার ব্যক্তিগত উদ্যম অনুপ্রেরণা রোধ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার মূল্যায়ন করে না, বহু স্থানে শ্রেণি সংগ্রামের নামে মানুষ হত্যা করে। উদাহরণ স্বরূপ এশিয়া মহাদেশেরই কম্বোডিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার নামে কয়েক লাখ লোক হত্যা করা হয়। পার্শ্ববর্তী ভারতে নকশাল পন্থীরা আজও শ্রেণী সংগ্রামের নামে হত্যা করে চলেছে। বাংলাদেশেও এক সময় গোপন বামপন্থী আন্দোলন কম-বেশী হত্যা কাণ্ড চালিয়েছে।

অপর পক্ষে ওসীয়্যত ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্র সবাই আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের সম্পত্তির (১/৩ হতে ১/১০ অংশ) জামা'তকে প্রদান করবে। এবং পৃথিবী ব্যাপী সেই সমাজ গঠনে সহায়তা করবে যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ ইন্না লাকা আল্লা তাজুআ ফীহা ওয়া লা তা'রা। ওয়া আন্নাকা লা তাযমাউ ফীহা ওয়া লা তাযহা। অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তোমার জন্য নির্ধারিত রয়েছে যেন এতে তুমি ক্ষুধার্ত না থাক এবং উলঙ্গ না থাক। এবং তুমি এতে পিপাসার্ত না থাক এবং রোদেও না পোড়ো (সুরা তা-হা আয়াত নং ১১৯ ও ১২০)। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সকল মানুষের জন্য খাদ্য, পোষাক, পানীয় ও বাসস্থানের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

কম্যুনিজমে ব্যক্তিযোগ্যতা, বুদ্ধি বৃত্তিক উৎকর্ষতা ও ব্যক্তি সম্পদের অধিকার অস্বীকারের ফলে মানুষের সৃষ্টিশীলতা নষ্ট হয়, সফলতার প্রেরণা থাকে না, ক্রম উন্নতির আকাঙ্খা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশ দুর্বল হতে থাকে। মূলত এই কারণেই মহাশক্তিধর ইউ.এস.এস.আর (সোভিয়েট রাশিয়া) এর পতন হয়েছে। বিনাযুদ্ধে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ (বলশেভিজম) এর ধারক বাহক সুপার পাওয়ার সোভিয়েট রাশিয়ার পত হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর পূর্বাভাসকে সত্য প্রমাণিত করেছে। প্রসঙ্গত ঃ বিষয়টি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর মূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ও সুদুর প্রসারি চিন্তা শক্তির পরিচয় বহন করেছে।

আরো উল্লেখ্য ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী 'নেযামে নও' কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতি ভিত্তিক হবে না বরং তা হবে আর্ন্তজাতিক। ফলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং পৃথিবী ব্যাপী জটিল সমস্যা সমূহ কেন্দ্রিয়ভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরপ, বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warm up)। বিশেষজ্ঞদের মতে এই শতাব্দীর মধ্যেই বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে বাংলাদেশের ১/৩ অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি বাংলাদেশীর পূর্নবাসন কিভাবে হবে? বর্তমানে জাতিসংঘ (UNO) কাঠামোতে এর কোন সমাধান নাই। কিন্তু ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নেযামে নও প্রতিষ্ঠিত হলে আর্ন্তজাতিক ভ্রাতৃত্ব বোধ ও কেন্দ্রিয় সম্পদ ব্যবহার করে পরিস্থিতি সাফল্য জনক ভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তেমনি ভাবে অন্যান্য বৈশ্বিক সমস্যা যেমন বিশ্ব খাদ্য ঘাটতি, কার্বন নিঃসারণ, ফসিল জ্বালানি স্বল্পতা, স্বাদু পানির ঘাটতি, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি সমাধানের জন্যও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ও কেন্দ্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে। খলিফাতুল মসীহ ২য় ও মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) লিখিত "নেযামে নও" পুস্তকের শেষ দুই অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ দিয়ে বিষয়বস্তু শেষ করছি ঃ

ওসীয়্যতকারী নেযামে নও এর ভিত্তি স্থাপনে অংশীদার

সুতরাং বন্ধুগণ যারা ওসীয়্যত করেছে তারা যেন বুঝে যে তাদের ভিতর যারা নিজ নিজ জায়গা ওসীয়্যত করেছে, তারা নেযামে নও এর ভিত্তি রেখেছে। সেই নেযামে নও যা তার ও তার বংশধরের হেফাজতের বুনিয়াদি পাথর স্বরূপ। যারা যারা তাহরীকে জাদীদে অংশ নিয়েছে, যদিও তারা নিজ দারিদ্রের জন্য উহাতে (ওসীয়্যতে) অংশ নিতে পারে নাই, এবং এই তাহরীকের সফলতার জন্য ক্রমাগত দোয়া করছে, তারাও নেযামে ওসীয়্যতের প্রসারের ভিত্তি রেখে দিয়েছে।

সুতরাং হে বন্ধুগণ দুনিয়ার নতুন ব্যবস্থা ধর্মকে বিলুপ্ত করে বানানো হচ্ছে। তোমরা তাহরীকে জাদীদ ও ওসীয়্যতের মাধ্যমে ধর্মকে কায়েম রেখে তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, কেননা দৌড়ে যে আগে চলে যাবে, সেই জিতবে।

তাড়াতাড়ি ওসিয়ত করা প্রয়োজন

সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি ওসীয়্যত কর, যেন তাড়াতাড়ি নেযামে নও এর দালান তৈরী হয়। এবং ঐ মুবারক দিন চলে আসে যখন চর্তুদিকে ইসলাম ও আহমদীয়তের ঝান্ডা উড়তে শুরু করে। সেই সাথে আমি ঐ সমস্ত বন্ধুদের মোবারকবাদ দিচ্ছি যারা ওসীয়্যত করার তৌফিক লাভ করেছে এবং আমি আরও দোয়া করছি, যেন আল্লাহ্ তা'লা ঐ সমস্ত লোকদের যারা এখনও এই নেযামে (ওসীয়্যতে) অংশ নেয় নাই, সামর্থ বান করেন যেন তারাও এতে অংশ নিয়ে ধর্মীয় ও পার্থিব বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং পৃথিবী এই নেযাম থেকে এরূপ ফায়দা লাভ করে যে অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হয় কাদিয়ানের ঐ গ্রাম যাকে অন্ধকার গ্রাম বলা হতো, যাকে অজ্ঞতার বসতি বলা হতো, তা থেকে ঐ জ্যোতি প্রকাশিত হলো যা কিনা সমস্ত দুনিয়ার অজ্ঞতা দূর করে দিয়েছে। যা কিনা সারা দুনিয়ার দুঃখ এবং কষ্টকে দূর করে দিয়েছে। এবং যা প্রত্যেক ধনী ও গরিবকে ছোট ও বড়কে ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা সহ পরস্পর একত্রে বসবাসের তৌফিক প্রদান করেছে।

“ভ্রমণ কর পৃথিবীময়”

মাহমুদ আহমদ সুমন

ভ্রমণের বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে এবং দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিতও করা হয়েছে। ভ্রমণের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন দেশ ও স্থান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায় তেমনি অভিজ্ঞতার পরিমান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর রাস্তাঘাটে চলাচল কর এবং তাঁর দেয়া রিয্ক থেকে খাও। আর তাঁর দিকেই (তোমাদের জীবিত করে) উঠানো হবে' (সূরা আল মুল্‌ক: ১৬)। আরো বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করে বানিয়েছেন, যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথসমূহে চলাচল করতে পার' (সূরা নূহ: ২০-২১)।

গত আগষ্ট মাসে লন্ডন জামেয়ার দুই ছাত্রকে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বাংলাদেশে একমাসের জন্য বাংলা শেখার উদ্দেশ্যে পাঠান। তাদেরকে বাংলা শেখানোর জন্য জামা'তের পক্ষ থেকে পাঁচজনকে শিক্ষক হিসেবে মনোনিত করা হয়, এ অধমও তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। রুটিন অনুযায়ী প্রত্যেহ ক্লাস শুরু হতো সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত, আবার ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। জনাব জাফর আহমদ সাহেব ক্লাসের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি সুন্দরভাবে সিলেবাস ও ক্লাস রুটিন তৈরী করলেন। সে অনুযায়ী ক্লাস চলে এবং শেষে পরীক্ষা নেয়া হয়। ছাত্রদেরকে ঢাকার আশে-পাশের কিছু ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করানো এবং সেগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব সদয় অনুমতি প্রদান করেন।

সেই সুবাদে নারায়ণঞ্জ-এর সোনারগাঁ এবং কুমিল্লার ময়নামতি দেখার জন্য তারিখ ঠিক করা হলো ১২ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার। ভোর ৬.৩০ মিনিটে আমরা সবাই বকশী বাজার থেকে দোয়ার মাধ্যমে জামা'তের লাল গাড়ী দিয়ে বের হই। গাড়ীতে আমরা পাঁচ জন ছিলাম, দু'জন ছাত্র জনাব আতায়ে রাব্বি হাদী এবং জনাব ফাতেহ আলম। এছাড়া শিক্ষক মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, খাকসার এবং ড্রাইভার জনাব খোকন সাহেব। সকাল ৯টার আগেই আমরা সোনারগাঁও পৌঁছে যাই। সেখানের একটি হোটেলে নাস্তার পর্ব শেষ করি। যেহেতু ১০টার পরে সোনারগাঁও জাদুঘর খোলে তাই প্রথমে এর পাশেই ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর পানাম নগরী দেখতে যাই।

যদিও পূর্বে সেখানে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এবার যাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। ছাত্রদেরকে ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে যেহেতু সঠিক ধারণা দিতে হবে তাই রাতেই 'উইকিপিডিয়া' এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে স্থানগুলোর তর্থ নিজের আয়ত্বে নিলাম। ***'পানাম নগর'*** নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁতে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন শহর। বড় নগর, খাস নগর, পানাম নগর– প্রাচীন সোনারগাঁর এই তিন নগরের মধ্যে পানাম নগর ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানে কয়েক শতাব্দী পুরনো অনেক ভবন রয়েছে, যা বাংলার বার ভূঁইয়াদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। সোনারগাঁর বিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই নগরী গড়ে

পানাম নগরীর সামনে বাম দিক থেকে- মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, লেখক, ফাতেহ আলম এবং আতায়ে রাব্বি হাদী-কে দেখা যাচ্ছে।

ওঠে। সোনারগাঁ লোক ও কারু শিল্প জাদুঘর থেকে উত্তর দিকে হাঁটাপথেই পৌঁছানো যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পানাম পুলে। যদিও পুলটি ধ্বংস হয়ে গেছে। পুলটির দৈর্ঘ্য ছিল ৭২ ফুট আর প্রস্থ ছিল ১৫.৫ ফুট, মাঝখানটা ছিল উঁচু। এই পুল পেরিয়ে পানাম নগর এবং নগরী চিরে চলে যাওয়া যায় পানাম সড়ক। আর সড়কের দুপাশে সারি সারি আবাসিক একতলা দ্বিতল বাড়ীতে ভরপুর পানাম নগর। আমরা সড়ক দিয়ে হাটছিলাম আর ভাবছিলাম যে, কত সুন্দরভাবেই না নগরটি তৈরী করা হয়েছিল। এই নগরীর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় ১৫ শতকে ঈশা খাঁ বাংলার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনাগাঁওয়ে। পূর্বে মেঘনা আর পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা নদীপথে বিলেত থেকে আসতো বিলাতি থানকাপড়, দেশ থেকে যেতো মসলিন। শীতলক্ষ্যা আর মেঘনার ঘাটে প্রতিদিনই ভিড়তো পালতোলা নৌকা। প্রায় ঐ সময়ই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইউরোপীয় অনুপ্রেরণায় নতুন ঔপনিবেশিক স্থাপত্যরীতিতে গড়ে ওঠে পানাম নগরী। পরবর্তীতে এই পোষাক বাণিজ্যের স্থান দখল করে নেয় নীল বাণিজ্য। ইংরেজরা এখানে বসিয়েছিলেন নীলের বাণিজ্য কেন্দ্র। ডব্লিউ ডব্লিউ, হান্টার-এর অভিমত হলো, সুলতানী আমলে পানাম ছিল সোনারগাঁর রাজধানী। কিন্তু পানামে, সুলতানী আমলের তেমন কোন স্থাপত্য নজরে পড়ে না, তাই এই দাবীটির সত্যতা সঠিক প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে জেমস্ টেলর বলেছেন, সোনারগাঁর প্রাচীন শহর ছিল পানাম। এই তত্ত্বটির সাথে বাস্তবের কোন বিরোধ নেই। শহরটিতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের দোতলা এবং একতলা বাড়ী রয়েছে প্রচুর। যার বেশীর ভাগ বাড়ীই উনবিংশ শতাব্দীর (১৮১৩ খৃষ্টাব্দের নামফলক রয়েছে)। মূলত পানাম ছিল হিন্দু ধনী ব্যবসায়ীদের বসতক্ষেত্র। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ছিল ঢাকা কলকাতা জুড়ে। তারাই গড়ে তোলেন এই নগর। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মোঘলদের সোনারগাঁও অধিকারের পর সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে রাজধানী শহরের সাথে পানাম এলাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পানাম পুল (বিলুপ্ত), দুলালপুর পুল ও পানাম নগর সেতুর অবস্থান ও তিনদিকের খাল বেষ্টনী থেকে বোঝা যায়, পানাম সোনারগাঁর একটা উপশহর ছিল। বাংলার স্বাধীন রাজা ঈসা খাঁর পদচারণা ছিল এই নগরীতে। সুলতানী আমল থেকে এখানে বিকশিত ছিল বাংলার সংস্কৃতি।

পানাম নগরীর পরিকল্পনাও নিখুঁত। নগরীর পানি সরবরাহের জন্য দু'পাশে দু'টি খাল ও পাঁচটি পুকুর আছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই আছে কূপ। নগরীকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখতে করা হয়েছে খালের দিকে ঢালু। প্রতিটি বাড়ী পরস্পরের থেকে সম্মানজনক দূরত্বে রয়েছে। নগরীর যাতায়াতের জন্য রয়েছে এর একমাত্র রাস্তা, যা এই নগরীর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে এপাশ-ওপাশ। নগরীর ভিতরে আবাসিক ভবন ছাড়াও আছে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মঠ, গোসলখানা, নাচঘর, পান্থশালা, চিত্রশালা, খাজাঞ্চিখানা, দরবার কক্ষ, গুপ্ত পথ, বিচারালয়, পুরনো জাদুঘর। এছাড়া আছে ৪০০ বছরের পুরনো টাকশাল বাড়ী।

এই নগরীটির অবক্ষয় সম্পর্কে যা জানা যায় তাহলো, ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক দাংগার সময় হিন্দু ব্যবসায়ীদের এই বসতী স্বাভাবিক ভাবেই ছিল লুটেরাদের লক্ষ্যবস্তু। ঐ সময় লুটেরারা দরজা-জানালা পর্যন্ত লুটে নিয়ে যায়। যুদ্ধের সময় বহু হিন্দু ব্যবসায়ী ভারতে পাড়ি জমালে পানাম প্রায় জনমানবহীন হয়ে পড়ে। সেই শুরু, তারপর থেকে আজও জেগে ওঠেনি পানাম। এরপর সরকারী ভাবে বাড়ীগুলোতে মনুষ্যবসতি গড়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে ও পরে বাড়ীগুলো ১০-১৫ বছরের ইজারা দেয়া হয় এবং পরে নবায়নও করা হয়। মূল বাসিন্দাদের অবর্তমানে বাড়ীগুলো অযত্নে ক্ষয়ে যেতে থাকে। ফলে বর্তমানে আর ইজারা নবায়ন করা হয় না।

তবে পানাম নগরীর ঐতিহ্য আর ইতিহাসকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এর পুণরুদ্ধারে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। সরকারী ভাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে নেয়া হয়েছে পানাম নগরের (সোনারগাঁ) প্রাচীন স্থাপত্য অবকাঠামো সংস্কার-সংরক্ষণ নামে একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ৪০টি ভবনের সংস্কার, ৪টি পুকুর ঘাট মেরামত ও পুণর্নির্মাণ, সেতু সংস্কার, প্রত্নসামগ্রী ক্রয় ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র তৈরী। এসব কবে বাস্তবায়ন হবে তা

সোনারগাঁও লোক ও কারু শিল্প জাদুঘর

আল্লাহ্‌পাকই ভালো জানেন। এসব দ্রুত বাস্তবায়ন হলে দশনার্থীর পদচারণায় মুখরিত থাকবে নগরটি সবসময়। এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা **সোনারগাঁও লোক ও কারু শিল্প জাদুঘরে** প্রবেশ করি। এর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, সোনারগাঁও বাংলার মুসলিম শাসকদের অধিনে পূর্ববঙ্গের একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা হচ্ছে সোনারগা। এর অবস্থান ঢাকা থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী ও উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। এখানের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো-ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল সোনাগাঁও, ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামে সোনারগাঁও-এর নাম করণ করা হয়, এখানে সোনাবিবির মাজার, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমাধি, ইব্রাহীম দানিশমান্দ-এর দরগা ইত্যাদি নানা রকম স্থাপনা রয়েছে, সোনারগাঁও-এ শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারু শিল্প জাদুঘর অবস্থিত।

সোনারগাঁও-এর ভিতরের পরিবেশ বেশ ভালো, পরিবারসহ ঘুরে আসতে পারেন, ভালো লাগবে, সাপ্তাহিক ছুটি বুধবার, প্রবেশ মূল্য ২০/-টাকা। এখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছি, আমাদের ভালই লেগেছে। এরপর কুমিল্লার ময়নামতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। নিজস্ব গাড়ীতে সোনারগাঁও থেকে কুমিল্লার ময়নামতি পৌঁছতে সময় লাগবে ২ঘন্টার মত। আমরা ময়নামতি পৌঁছে একটি হোটেলে দুপুরের খাবার পর্ব সেরে নেই।

ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। এ যাবৎ আবিষ্কৃত লালমাই অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হল ময়নামতি প্রত্নস্থল। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে ধ্বংশস্তুপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী ও বৌদ্ধ বিহারের অবশিষ্টাংশ। প্রত্নতাত্বিকদের মতে এটি জয়কর্মান্তবসাক নামক একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। আমরা প্রথমে যাই শালবন বৌদ্ধ বিহার দর্শনে।

শালবন বৌদ্ধ বিহার বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি প্রত্নস্থলের অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনাগুলোর একটি হলো বৌদ্ধ বিহার। এটি ১২শ প্রত্নতাত্বিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। কুমিল্লার ময়নামতিতে খননকৃত সব প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম প্রধান। কোটবাড়ির বার্ডের কাছে লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় এ বিহারটির অবস্থান। বিহারটির আশ-পাশে এক সময় শাল-গজারির ঘন বন ছিল বলে এ বিহারটির নামকরণ হয়েছিল শালবন বিহার। এর সন্নিহিত গ্রামটির নাম শালবনপুর। এখনো ছোট একটি বন আছে সেখানে।

এ বিহারটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মতো হলেও আকারে ছোট। ধারণা করা হয় যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে দেব বংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। শালবন বিহারের প্রতিটি বাহু ১৬৭.৭ মিটার দীর্ঘ। বিহারের চারদিকের দেয়াল ৫ মিটার পুরু। কক্ষগুলো বিহারের চারদিকের বেষ্টনী দেয়াল পিঠ করে নির্মিত। বিহারে ঢোকা বা বের হওয়ার মাত্র একটাই পথ ছিল। এ পথ বা দরজাটি উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে। প্রতিটি কক্ষের মাঝে ১.৫ মিটার চওড়া দেয়াল রয়েছে।

বিহার অঙ্গনের ঠিক মাঝে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দির। বিহারে ছোট ছোট কক্ষ দেখে অনেকে না জানার কারণে বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকে, কেউ বলছিল এগুলো টয়লেট ছিল, কেউ বলছিল দোকান ছিল, যেহেতু আমরা জানতাম এগুলো আসলে কি ছিল তাই দর্শনার্থীদের অনেককেই বলতে হলো কক্ষগুলো সম্পর্কে। বিহারে সর্বমোট ১৫৪ টি কক্ষ আছে। কক্ষের সামনে ৮.৫ ফুট চওড়া বারান্দা ও তার শেষ প্রান্তে অনুচ্চ দেয়াল। প্রতিটি কক্ষের দেয়ালে ৩টি করে কুলুঙ্গি রয়েছে। কুলুঙ্গিতে দেবদেবী, তেলের প্রদীপ ইত্যাদি রাখা হতো।

এই কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন। সেখানে তারা বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্মচর্চ্চা করতেন। বিহারের বাইরে প্রবেশ দ্বারের পাশের দক্ষিণ পূর্বকোনে একটি হল ঘর রয়েছে। চারদিকের দেয়াল ও সামনে চারটি বিশাল গোলাকার স্তম্ভের ওপর নির্মিত সেই হল ঘরটি ভিক্ষুদের খাবার ঘর ছিল বলে ধারণা করা হয়। হল ঘরের মাপ ১০ মিটার গুণন ২০ মিটার।

শালবন বৌদ্ধ বিহারে বাম দিক থেকে- আতায়ে রাব্বি হাদী, ফাতেহ আলম, মওলানা মোস্তাফিজুর রহমান এবং লেখক।

হল ঘরের চারদিকে ইটের চওড়া রাস্তা রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ থেকে আটটি তাম্র লিপি, প্রায় ৪০০ টি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, অসংখ্য পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটা, সিলমোহর, ব্রোঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। এইগুলো বাংলাদেশের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহণ করছে। ময়নামতি প্রত্নস্থলের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো-কোটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, চারপত্র মুড়া, শালবন বিহার এবং ঐতিহাসিক নিদর্শন ওয়ার সেমেট্রি। ওয়ার সেমেট্রি ছাড়া বাকী সবগুলো ঐতিহাসিক স্থানে গিয়েছি। তবে ***ময়নামতি ওয়ার সেমেট্রি*** সম্পর্কেও তাদের ধারণা দেয়া হয়।

ময়নামতি ওয়ার সেমেট্রি বাংলাদেশের কুমিল্লাতে অবস্থিত একটি কমন ওয়েলথ যুদ্ধ সমাধি। ১৯৪১-১৯৪৫ সালে বার্মায় সংঘটিত যুদ্ধে যে ৪৫ হাজার কমন ওয়েলথ সৈনিক নিহত হন, তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে মায়ানমার (তৎকালীন বার্মা), আসাম এবং বাংলাদেশের ৯ টি রণ সমাধি ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ২ টি কমন ওয়েলথ রণ সমাধি ক্ষেত্র আছে, যার অপরটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। প্রতি বছর প্রচুর দর্শনার্থী যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রতি সম্মান জানাতে এ সকল রণ সমাধি ক্ষেত্রে আসেন। ময়নামতি রণ সমাধিক্ষেত্র মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) নিহত ভারতীয় (তৎকালীন) ও বৃটিশ সৈন্যদের কবরস্থান। এটি ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে তৈরী হয়েছে।

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের খুব কাছেই এই যুদ্ধ সমাধির অবস্থান। কুমিল্লায় তৎকালীন সময়ে ছিল অনেক বড় হাসপাতাল। এছাড়া কুমিল্লা ছিল যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্র, বিমান ঘাঁটি, আর ১৯৪৪ সালে ইমফলে স্থানান্তরিত হবার আগে চতুর্দশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর। এই সমাধিক্ষেত্রে ৭৩৬ টি কবর আছে।

এর মধ্যে অধিকাংশ হলেন সেই সময়কার হাসপাতালের মৃত সৈনিকরা। তাছাড়াও যুদ্ধের পর বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু লাশ স্থানান্তর করেও এখানে সমাহিত করা হয়। বাহিনী অনুযায়ী এখানে এর মধ্যে রয়েছেন তিনজন নাবিক, ৫৬৭ জন সৈনিক এবং ১৬৬ জন বৈমানিক। সর্বমোট ৭২৩ জন নিহতের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ যে সকল দেশের বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন সেগুলি হলো– যুক্তরাজ্যের ৩৫৭, কানাডার ১২, অষ্ট্রেলিয়ার ১২, নিউজিল্যান্ডের ৪, দক্ষিণ আফ্রিকার ১,

শালবন বৌদ্ধ বিহার

মোঘল আমলের বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন, লালবাগ কেল্লা, পরী-বিবির মাজার।

অবিভক্ত ভারতের ১৭৮, রোডেশিয়ার ৩, পূর্ব আফ্রিকার ৫৬, পশ্চিম আফ্রিকার ৮৬, বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার) ১, বেলজিয়াম ১ এবং পোল্যান্ডের ১।

সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটের দিকে কুমিল্লার মসজিদে যাই, সেখানে দায়িত্বরত মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ সাহেব সবার জন্য উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন, আল্লাহ্ তার এ সেবা গ্রহণ করুন। বাদ এশা স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব-এর সভাপতিত্বে একটি তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে একজন আহমদীর যুগ খলীফার সাথে কেমন সম্পর্ক থাকা চাই সে বিষয়ে দু'জন ছাত্র অত্যন্ত গুরুত্ব বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে দোয়া করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রৌনা হই। কিছুক্ষণ গাড়ী চলার পরেই হঠাৎ গাড়ীর সমস্যা দেখা দেয়। প্রায় ৪ঘন্টা চেষ্টা করে কোনভাবে ঠিক করে ধিরে ধিরে ঢাকার পথে আসতে থাকি। বকশী বাজার এসে পৌঁছি ভোর ৫টার দিকে।

কয়েক দিন আবার পুরোদমে ক্লাস চলে। গত ১৯ আগষ্ট সকালের ক্লাস শেষে দুপুরের দিকে বকশী বাজার থেকে রিকশা যোগে রৌনা দেই লালবাগ কেল্লা দেখার উদ্দেশ্যে, বকশী বাজার থেকে খুবই কাছে এর অবস্থান।

লালবাগ কেল্লা, মোঘল আমলের বাংলাদেশের একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন যাতে একই সাথে ব্যবহার করা হয়েছে কষ্টিপাথর, মার্বেল পাথর আর নানান রংবেরং-এর টালি। লালবাগ কেল্লা ছাড়া আর বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনে এমন কিছুর সংমিশ্রণ পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত। প্রায় প্রতিদিন হাজারো দেশি-বিদেশি দশনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয় ঢাকার লালবাগ এলাকার এই দূর্গটি।

স্বাভাবিকভাবে যে কেউ যদি এর নামকরণের কারণ চিন্তা করে তাহলে তার মাথায় আসবে লালবাগে থাকার কারণেই হয়তো এর নাম লালবাগ রাখা হয়েছে। ধারণাটি মোটেও ভুল নয়, আসলেই এর নামকরণ করা হয়েছে এলাকার ওপর ভিত্তি করে। তবে প্রথমে এর নাম ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যাতে এলাকার কোন প্রভাব ছিল না। একদম শুরুর দিকে এ কেল্লার নাম ছিল 'কেল্লা আওরঙ্গবাদ'।

নামটা শুনতে যদিও একটু অন্যরকম তবুও সম্রাটদের নামকরণ বলে কথা। তারা এমনটাই পছন্দ করতেন হয়তো। এর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৬৭৮ সালে। তৎকালীন মুঘল সম্রাট আজম শাহ্ এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যদিও আজম শাহ্ খুব কম সময়ের জন্যই মোঘল সম্রাট হিসেবে ছিলেন। তবুও তার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার এই অসাধারণ কাজটি শুরু করেন। উল্লেখ্য আজম শাহ ছিলেন মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর পুত্র আর সম্রাট শাহ জাহানের নাতি, যিনি তাজমহল তৈরীর জন্য বিশ্বমহলে ব্যাপক সমাদৃত।

এই দূর্গ নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার প্রায় এক বছরের মাথায় তার বাবার ডাকে তাকে দিল্লীতে চলে যেতে হয় সেখানকার মারাঠা বিদ্রোহ দমন করবার জন্য। সম্রাট আজম শাহ চলে যাওয়ার পর দূর্গ নির্মাণের কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়ে

লালবাগ কেল্লায় বাম দিক থেকে- ফাতেহ আলম, লেখক এবং আতায়ে রাব্বি হাদী।

যায়। তখন এই দূর্গ নির্মাণের কাজ আদৌ সম্পূর্ণ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়।

কিন্তু সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৎকালীন নবাব শায়েস্তা খাঁ পুনরায় লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করে দেন কাজ থেমে যাওয়ার প্রায় এক বছর পরে। পুরো উদ্যোমে আবার কাজ চলতে থাকে দূর্গ নির্মাণের। তবে শায়েস্তা খাঁ পুনরায় কাজ শুরু করার প্রায় চার বছরের মাথায় দূর্গের নির্মাণ কাজ আবার বন্ধ হয়ে যায়, এরপর দূর্গটি নির্মাণের কাজ আর শুরু করা হয়নি। নবাব শায়েস্তা খাঁ-এর মেয়ে পরী বিবি মারা যাওয়ার কারণেই মূলত শায়েস্তা খাঁ লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন।

পরী বিবির মৃত্যুর পরে সবার মধ্যে দূর্গটি সম্পর্কে বিদ্রূপ ধারণা জন্ম নেয়, সবাই দূর্গটিকে অপয়া ভাবতে শুরু করে দেয়। পরী বিবির মৃত্যুর পর তাকে লালবাগ দূর্গের মাঝেই সমাহিত করা হয়। এরপর থেকে একে পরী বিবির সমাধি নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরী বিবির সমাধির যে গম্বুজটি আছে তা এক সময় স্বর্ণখোচিত ছিল, কিন্তু এখন আর তেমনটি নেই, তামার পাত দিয়ে পুরো গম্বুজটিকে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

লালবাগ কেল্লার তিনটি বিশাল দরজার মধ্যে যে দরজাটি বর্তমানে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে বরাবর সোজা চোখে পরে পরী বিবির সমাধি। সচরাচর টেলিভিশনে, খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে আমরা লালবাগ কেল্লার যে ছবিটি দেখি সেটা মূলত পরী বিবির সমাধির ছবি। কেল্লাতে একটি মসজিদ আছে, আজম শাহ দিল্লীতে চলে যাওয়ার আগেই তিনি এই মসজিদটি তৈরী করে গিয়েছিলেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি যে কারো দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম। মসজিদটিতে এখনো জামাত নামায আদায় করা হয়, ঢাকায় এত পুরনো মসজিদ খুব কমই আছে।

লালবাগ কেল্লাতে এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি ফোয়ারার দেখা মিলবে, বেশিরভাগ সময়ই এগুলো বন্ধ থাকে। কেল্লাতে সুরঙ্গ পথও আছে, শুনেছি আগে নাকি সুরঙ্গ পথগুলোতে যাওয়া যেত, এখন যাওয়া যায় না। লালবাগ কেল্লায় সর্বসাধারণের দেখার জন্য একটি জাদুঘর রয়েছে, যা পূর্বে নবাব শায়েস্তা খাঁ এর বাসভবন ছিল আর এখান থেকেই তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন।

জাদুঘরটিতে দেখার মত অনেক কিছুই রয়েছে। মুঘল আমলের বিভিন্ন হাতে আঁকা ছবির দেখা মিলবে সেখানে, যেগুলো দেখলে যে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। শায়েস্তা খাঁ-এর ব্যবহার্য নানান জিনিস পত্র সেখানে সযত্নে রয়েছে। তাছাড়া তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, পোশাক, সে সময়কার প্রচলিত মুদ্রা ইত্যাদিও রয়েছে। জনপ্রতি টিকেট এর দাম দশ টাকা করে তবে পাঁচ বছরের কম কোন বাচ্চার জন্য টিকেট এর দরকার পড়ে না। এছাড়া যেকোন বিদেশি দর্শনার্থীর জন্য টিকেট মূল্য একশো টাকা করে।

লালবাগ কেল্লার সমসূচী:

গ্রীষ্মকালে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কেল্লা খোলা থাকে। মাঝখানে দুপুর ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত আধ ঘন্টার জন্য বন্ধ থাকে। আর শীতকালে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। কেল্লা রবিবার বন্ধ থাকে এছাড়া যে কোন সরকারী ছুটির দিনেও কেল্লা বন্ধ থাকে। এরপরের দিন ২০ আগষ্ট সকালের ক্লাস শেষে আহসান মঞ্জিল দেখার উদ্দেশ্যে বকশী বাজার থেকে রিকশা যোগে রৌনা হই।

আহসান মঞ্জিল: বুড়িগঙ্গার তীরে ইসলামপুরের কুমারটুলিতে রয়েছে বাংলার অন্যতম নজড়কাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন আহসান মঞ্জিল। প্রায় প্রতিদিনই দেশ বিদেশ থেকে আগত দর্শনার্থীর পদচাড়ণায় মুখরিত থাকে এই গোলাপী প্রাসাদ তথা আহসান মঞ্জিল। ইতিপূর্বে বড় উৎসাহ নিয়ে ঈদের পর আমার মিসেসকে নিয়ে একবার গিয়েছিলাম কিন্তু দু:খের বিষয় হলো সেদিন আহসান মঞ্জিল বন্ধ ছিল। তাই এবার বন্ধের দিনটিকে মাথা রেখে ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে যাই।

২০ টাকা করে টিকেট কেটে ভিতরে প্রবেশ করি। এর ইতিহাস সম্পর্কে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলে তারা না সূচক উত্তর দেয়। আমার কাছে যেহেতু এ সম্পর্কে নোট রয়েছে তাই ফাতেহ এবং আতায়ে রাব্বিকে বলতে শুরু করলাম এই যে বর্তমানে যে জায়গার ওপর আহসান মঞ্জিল দাঁড়িয়ে আছে সেটা পূর্বে ইসলামপুরের কুমারটুলি নামে পরিচিত ছিল। এটি ঢাকা শহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। জমিদার শেখ এনায়েতুল্লাহ্

দর্শনার্থীর পদচাড়ণায় মুখরিত বাংলার অন্যতম নজড়কাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন আহসান মঞ্জিল।

তৎকালীন জালালপুর পরগণায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'রংমহল' নামে একটি প্রমোদভবন তৈরী করেন। অত:পর কিছুদিন পরে শেখ এনায়েতুল্লাহ্ মারা গেলে তার ছেলে শেখ মতিউল্লাহ্ বিলাস বহুল প্রমোদভবন 'রংমহলটি' তৎকালীন ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন। এরপর সেখানে ফরাসিরা তাদের বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ফরাসিরা এই এলাকায় (বর্তমান যে অংশে আহসান মঞ্জিল আছে) উত্তর-পশ্চিম কোনায় 'ল্যুসজাল্লা' নামে একটি চৌবাচ্চা নির্মাণ করে। চৌবাচ্চাটি ছিল অপেক্ষাকৃত গোলাকার। কিছু দিন পর ১৮৩০ সালে খাজা আলিমুল্লা ফরাসি বণিকদের কাছ থেকে কুঠিরটি কিনে নেন এবং বসবাসের উদ্দেশ্যে সংস্কার করেন। খাজা আলিমুল্লাহ্‌র ছেলে নওয়াব আব্দুল গনি ১৮৫৯ সালে প্রাসাদটি পুনরায় নির্মাণ করেন আর প্রাসাদটি তাঁর স্বীয় পুত্র খাজা আহসানুল্লাহ্‌র নামেই নামকরণ করে রাখেন "আহসান মঞ্জিল"।

অত:পর ১৮৮৮ সালের ৭ই এপ্রিল প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে মঞ্জিলের অন্দরমহলের বেশ কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়, সব মিলিয়ে প্রলয়ঙ্কারী এই ঘূর্ণিঝড়ে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পরবর্তীতে আহসান মঞ্জিলকে পূনর্নির্মাণ করা হয় এবং বর্তমানে যে সুউচ্চ গম্বুজটি দেখতে পাওয়া যায় এমনই একটি গম্বুজ যুক্ত করা হয়। তৎকালীন সময়ে আহসান মঞ্জিলের মত এত সুউচ্চ ভবন ঢাকায় ছিল না। তাই তখন বহুদূর থেকেও আহসান মঞ্জিলের জাঁকালো গম্বুজটি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। বড় গম্বুজসহ যে অংশটি রয়েছে তাকে বলা হয় প্রাসাদ ভবন, যেটা আগে রংমহল ছিল আর এর পাশেই আরেকটা অন্দরমহল আছে, যা 'জানানা' নামেও পরিচিত।

গম্বুজওয়ালা প্রাসাদ ভবনটি দুটি সুষম ভাগে ভাগ করা। মাঝখানে গোলাকার কক্ষের ওপরে সুউচ্চ অষ্ট-কোণ গম্বুজটি উত্তোলিত। এর পূর্বাংশে দোতলায় বৈঠকখানা, প্লেয়িং কার্ড রুম, গ্রন্থাগার ও তিনটি মেহমান কক্ষ এবং পশ্চিমাংশে একটি নাচঘর, হিন্দুস্থানী কক্ষ এবং কয়েকটি আবাসিক কক্ষ রয়েছে। যা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। নীচতলায় পূর্বাংশে আছে ডাইনিং হল এবং পশ্চিমাংশে দরবার ঘর, বিলিয়ার্ড কক্ষ এবং কোষাগার। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে এবং অন্যান্য কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ঢাকার নওয়াবগণ স্থানীয় মহাজন এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। অব্যবস্থায় পতিত জমিদারী পরিচালনার ভার ১৯০৭ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন।

১৯১৫ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহ্ মারা যাওয়ার পর তার স্বীয় পুত্র হাবিবুল্লাহ্ তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হলে ঋণের দায়ে একের পর এক জমিদারী পরগণাসমূহ হারাতে থাকেন। তাছাড়া অন্যান্য সন্তানেরা যার যার মত সম্পত্তি নিয়ে আলাদা হয়ে যান। নিজেদের মধ্যে অন্ত:কোন্দল এরফলে ধীরে ধীরে অবহেলায় ভবনটি পরিত্যক্ত হতে থাকে। অত:পর ১৯৫৮ সালে নওয়াব হাবিবুল্লাহ্ মারা গেলে তার পুত্র খাজা হাসান আসকারি নামেমাত্র নওয়াব হন। অত:পর বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনার পর, বিভিন্ন নেতাবৃন্দের বিভিন্ন পরিকল্পনা, সম্মতির পরে ১৯৯২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আহসান মঞ্জিলকে জাদুঘর হিসেবে উদ্বোধন করা হয়।

এখানে দেখার মত অনেক কিছুই আছে, স্বপরিবারে/সবান্ধব ঘুরে আসতে পারেন বাংলার ঐতিহাসিক এই স্থানটি থেকে। যারা ইতিপূর্বে আহসান মঞ্জিল যান নি, তাদের বাসা যদি পুরান ঢাকা থেকে খুব বেশী দূরে হয় তাহলে সরাসরি সিএনজি-তে করে আহসান মঞ্জিলে আসতে পারেন। আর যদি বাসা কাছে হয় পুরান ঢাকায় তাহলে রিকশা নিয়েই যেতে পারেন। যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসবেন তারা বাসে/লঞ্চে করে বাবুবাজার/সদরঘাট পর্যন্ত এসে রিকশা করে চলে আসতে পারেন। জাদুঘর প্রদর্শনীর সময়: সকাল ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে জাদুঘর খুলে দেয়া হয়। টিকিট কেটে আপনাকে ঢুকতে হবে, টিকেট মূল্য ২০/- টাকা। সাধারণত সন্ধার আগ পর্যন্ত খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ আর শুক্রবার বিকাল ৩ টায় খোলে। কিছুক্ষণ সময় আহসান মঞ্জিলে কাটিয়ে আবার রিকশা দিয়ে বকশী বাজার চলে আসি।

পবিত্র এই ঈদুল আযহার ছুটিতে ভ্রমণপ্রিয়াসীরা ঘুরে আসতে পারেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানগুলো থেকে। এসব নিদর্শন দেখে নি:সন্দেহে সবাইকে এক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিবে। ভ্রমণ হোক জ্ঞানের মাধ্যম, ভ্রমণ হোক ইসলাম প্রচারের মাধ্যম, এই কামনাই করি।

মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ পাক বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রকৃতির মাঝে অনেক কিছুই লুকায়িত আছে আর তা মাঝে মাঝে আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায়। মানুষের স্বভাব পরিবর্তনশীল। ইচ্ছে করলে মানুষ নিজের মধ্যে এক অভিনবরূপ ধারণ করতে পারে। আবার পারে নিজেকে একেবারে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যর মাঝে ফেলে দিতে। মানব স্বভাবে দোষ-গুণ দু'টিই পরিলক্ষিত হয়।

কারো মাঝে বেশী আবার কারো মধ্যে কম অনুভূত হয়। একনিষ্ঠ চেষ্টা-সাধনা মানুষকে পরিপূর্ণ রূপ এনে দিতে পারে মানব আত্মা, মানবের প্রকৃতি, মানবের মান-মর্যাদা, মানব সৃষ্টি ও ক্রম বিবর্তন এইসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার দান।

আল্লাহ্ মানবকে নিজ প্রকৃতিক স্বভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে মিতাচার ও অমিতাচার পরখ করার স্বভাবজ যোগ্যতা ও ক্ষমতা রয়েছে। মানুষ নিজ কর্মে স্বাধীন এবং মানুষের জন্ম-মৃত্যু ও পুনরুত্থান এ পৃথিবীর সাথেই সংযুক্ত। মানব সৃষ্টির মাঝে বিশাল প্রজ্ঞা এবং সুগভীর রহস্যাবলী রয়েছে। যাহোক এই মানুষকে নিয়েই এই পৃথিবীতে আমাদের বসবাস। তাই মানুষের স্বভাবের দশটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং এর ক্ষতি ও প্রতিকারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

(১) 'ন্যায় বিচার' যা ধ্বংস করে জুলুমকে, মানুষের মাঝে যদি সত্যিকার ন্যায় বিচার থাকতো তাহলে জুলুম-নির্যাতন এমনিতেই কমে যেত। ন্যায় বিচারের অভাবে মানুষ আজ বড়ই অত্যাচারিত। পবিত্র কুরআনে বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ন্যায় বিচারের নির্দেশনা রয়েছে। সামাজিক ভাবে এগুলোর প্রতিফলন ঘটানোর আবশ্যকতা রয়েছে। ন্যায় বিচারের অভাবে সমাজ কুলুষিত হচ্ছে। যিনি বিচার করবেন, তার মাঝে ন্যায় প্রতিফলিত হতে হবে। তবেই সে সমাজের বা জাতির মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। ন্যায় বিচারের জন্য তাক্ওয়ার মান উন্নত হওয়ার সর্বাদিক চেষ্টা মানুষের জীবনে গড়ে তোলা খুবই জরুরী। সমাজের সবাই চায় সর্বস্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন, "আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায় পরায়ণতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্র উপদেশ কতই চমৎকার। আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। এই আয়াতে বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন।

আল্লাহ্ তা'লা পুণরায় বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায় বিচার করো। এ (কাজটি) তাক্ওয়ার সবচে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত"। (সূরা মায়েদা :৯) আত্মীয়-অনাত্মীয় এমন কি শত্রু হলেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব। কোন অবস্থায় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়।

হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "ন্যায় নীতিবান বিচারক (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকট তাঁর ডান পাশে নূরের (উজ্জ্বল জ্যোতির) মিম্বরের ওপর অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লার উভয় পার্শ্বই ডান। তারাই সেই সকল বিচারক বা শাসক যারা নিজেদের বিচার বিধানে নিজেদের

পরিবার-পরিজনের এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় (মোটকথা সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে) ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে"। (মুসলিম)

অপর এক হাদীসে এসেছে, হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি হযরত রসূল করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি, 'যাকে আল্লাহ্ লোকের নিগরান করেন, যদি সে লোকের নিগরানী ও তার কর্তব্য পালনে ত্রুটি করে তবে তার মৃত্যুর পর তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম (নিষিদ্ধ) করবেন। তার বেহেশ্‌ত নসীব হবে না"। (মুসলিম)

সুতরাং বুঝা গেল, ইহজীবনের অন্যায়-আচরণ পরকালে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। এমন কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রণীত পুস্তক 'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'তে বলেন, "কুরআন শরীফ বলেছে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের নিকট শুধু এটাই চান যে, তোমরা সমস্ত মানবজাতির প্রতি আদল বা ন্যায় বিচার কর, তদুপরি যারা তোমাদের কোন উপকার করেনি তাদের প্রতিও এহসান বা উপকার কর। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টজীবের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যথা মাতা সন্তানের প্রতি করে থাকে"।

ন্যায় বিচারের পাশাপাশি সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রেও ন্যায় পরায়ণতা অবলম্বন করা উচিত। সত্য সাক্ষী সর্বদা মানুষকে বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে। কোন অবস্থাতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া উচিত নয়। মিথ্যা মানুষকে মন্দের দিকে ধাবিত করে এবং ঈমান কলুষিত হয়ে যায়।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) পুণরায় বলেন, "আজকাল তো মানুষের এই অবস্থা যে, মাত্র তিন আনার বিনিময়ে মানুষ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। উকিলেরা কি শপথ করে বলতে পারে যে, তারা আদালতে সত্য কথা বলে এবং সত্যের অনুসরণ করে? ওরা শুধু নিজেদের স্বার্থকে বাঁচিয়ে সত্য মিথ্যা যা কিছু সম্ভব বলতে থাকে"। "এই কী ধর্ম? আর আল্লাহ্ তা'লা কি এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা লাগাম ছাড়া হয়ে যাও এবং মিথ্যাকে মাতৃদুগ্ধ জ্ঞান কর? আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে শির্‌কের সাথে যুক্ত করে এর প্রত্যেকটিকে একই ভাবে নিষিদ্ধ করেছেন?" (আহমদী ও গয়ের আহমদীতে পার্থক্য)। সুতরাং আসুন, আমরা সমাজের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল প্রকার জুলুম হতে নিজেরা বাঁচি এবং পুরো জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করি।

(২) 'সদকাহ্' যা ধ্বংস করে মুসিবতকে। সকল প্রকার বালা-মুসিবতকালে সাধারণত মানুষ সদকা বা দান খয়রাত প্রদান করে থাকে। যাতে করে বিপদাবলী কেটে যায়। অনেকে আবার পশু যবাই করে অংশ বিতরণের মাধ্যমে সদকাহ আদায় করে থাকেন। সদকা সাধারণত গরীব, অসহায় ও অভাবীদের প্রাপ্য। ধনীদের সর্বদা অভাবী আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। সাদকা আদায়ের মাধ্যমে সকল প্রকার মুসিবত দূর হতে পারে।

পবিত্র কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "সদকা কেবল অভাবী, অসহায় এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদের প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দায়মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণ মুক্তির জন্য) এবং আল্লাহ্‌র পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাবান। (সূরা আত্ তাওবা: ৬০)

কুরআনের এই আয়াতে সদকা প্রাপ্যদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কারা সদকা পাবে বা কাদের সদকা প্রদান করতে হবে। 'সাদাকাত' এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদকা অর্থাৎ যাকাত। এ আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির ওপর প্রদেয় তার স্বরূপ নির্ধারণ করেছে, যথা (ক) 'ফোকারা' একবচনে ফকির (মূল শব্দ ফাকারা) যার অর্থ, এটা তার পিঠের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল (লেইন)। অর্থাৎ দরিদ্র অথবা রোগ-ব্যধিতে যারা ভেঙ্গে পড়ে তারা, (খ) 'মাসাকীন' (এক বচনে মিসকীন, মূল শব্দ সাকানা) অর্থাৎ সেই সকল লোক যারা কর্মক্ষম কিন্তু তাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সেইসব লোক যারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত (ঘ) অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিম যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, (ঙ) গোলাম, কয়েদী এবং অনুরূপ অন্যান্য লোকজন যাদেরকে আজাদ বা মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিপণ দিতে হবে, (চ) যারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসাধারণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি। (ছ) যে কোন সৎকাজের জন্য এবং (জ) মুসাফিরিতে অর্থাভাবে যারা অসহায় অবস্থায় নিপতিত অথবা যারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে। সদকা বা যাকাত প্রাপ্যদের ব্যাপারে নবী করীম (সা.) যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তা দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্চনীয়। সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে উক্ত অর্থ বিলি বন্টন করা সমাজের নেতৃস্থানীয়দের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'যাকাত হালাল নয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য আর না শক্তিমান পূর্ণাঙ্গ (অবিকালঙ্গ) ব্যক্তির জন্য' (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

এ ব্যাপারে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামের ৪র্থ রোকন যাকাত বা বৈধ দান প্রদান। এর আরবী শব্দের অর্থ পবিত্রতা। সুতরাং ইসলামের এই নির্দেশের লক্ষ পবিত্রতা। অনেকে এমন আছে যারা বদান্যতাস্বরূপ দান করে, কিন্তু তাদের উপার্জন হালাল কি হারাম তার প্রতি নযর দেয় না। কিন্তু ইসলামে যাকাত কেবলমাত্র হালাল উপার্জন এবং অন্যের ক্ষতি না করে উপার্জিত সম্পদ হতে প্রদান করতে হয়। বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে যাকাত প্রদান করার ফলে তার উপার্জিত সম্পদ পবিত্র হয়" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা)।

একথা স্পষ্ট যে, অর্থ সম্পদকে পবিত্র করতে হলে অর্থ দান করা জরুরী। অর্থ অপচয় না করে বরং তা সঠিক ব্যবহার করা অপরিহার্য্য। অর্থই মানুষকে খোদা

হতে দূরে ঠেলে দেয়। তাই সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম সম্পাদন করা মু'মিনের জন্য আমলে সালেহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "খয়রাত ও সদকা প্রভৃতিতে যে মাল দেয়া হয় তাতে লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথমে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিতে হবে। অবশ্য যারা খয়রাতের মাল আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করে বা তার শৃংখলা রক্ষা করে তারাও খয়রাতের মাল হতে কিছু খেতে পারে এবং তাকেও অমঙ্গল হতে বাঁচানোর জন্য এ অর্থ হতে কিছু দেয়া যেতে পারে। তেমনি দাসমুক্তি (যুদ্ধবন্দীমুক্তি) ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে এবং অন্য প্রকারের যা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য হয়, ঐ সকল মাল খরচ হবে" (ইসলামী নীতিদর্শন)।

(৩) তওবা– যা ধ্বংস করে গুনাহকে। পাপ থেকে পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভের উপায় হলো সঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

সূরা আত্‌তাহরীমের ৯ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আন্তরিকভাবে তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হও (এর ফলে) তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালক তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিতে পারেন এবং এরূপ জান্নাতসমূহে তোমাদের প্রবেশ করাতে পারেন যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়"। এই আয়াতে যে বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তাহলো আন্তরিকভাবে তওবা করা এবং বিনত হওয়া। তওবার ক্ষেত্রে অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে। আর বিনয়ের যত পথ আছে তা অবলম্বন করা। বিনয় ব্যতীত তওবা কবুল হওয়া খুব কঠিন। আল্লাহ্ তা'লা বিনয়ীদের ভালবাসেন।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফুরকানে বলেছেন, "আর যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকাজ করে নিশ্চয় সে তওবা করার (মাধ্যমে) পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হয় (২৫:৭২)। প্রত্যেক মু'মিনকে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, তওবার দ্বারা বিনয় সৃষ্টি হয়। নিজেকে যখন কেউ অপরাধী মনে করে তখন তার মাঝে বিনয় ভাব প্রকাশ পায়। আর বিনয়ীতা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। 'তওবা' (অনুশোচনা) এর অর্থ– অতীতের সমস্ত নৈতিক ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিক ভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলার স্থির সংকল্পের সাথে অনুতাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা। ব্যক্তির জীবনে এ হচ্ছে অতীতের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে পিঠ ফিরিয়ে পূর্ণ পরিবর্তন সাধন।

হাদীস হতে জানা যায়, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে (তওবা করে) আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া করেন" (বুখারী, মুসলিম)।

ইবনে মাজাহর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "গোনাহ্ হতে তওবাকারী তার ন্যায়, যার কোন গোনাহ নেই"। সুতরাং বুঝা গেলো, পাপ বা গুনাহ দূরীভূত করার একটি উত্তম মাধ্যম হলো আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা। যে যত বেশী বিনয়ের সাথে তওবা করবে আল্লাহ্‌ও তত বেশী ক্ষমা করবেন। তওবা করার ব্যাপারে মুসলিম শরীফের অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো এবং গুনাহ মাফ চাও আমি একদিনে একশতবার তওবা করি।" বিশ্বনবী (সা.) যদি এতবেশী তওবা করে থাকেন তাহলে আমরা দুর্বল মানুষ হিসেবে আরও কত বেশী নিজেদের পাপের জন্য তওবা করা উচিত তা একটু চিন্তা করা দরকার। হাদীসে এটাও বলা হয়েছে, বান্দার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তওবা কবুল করে থাকেন। অতএব প্রতিনিয়ত আমাদের তওবা করে যাওয়া উচিত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন, "নতুবা কুরআন শরীফে ভুরিভুরি সংখ্যায় পাওয়া যায় যে, লজ্জিত হয়ে তওবা করলে এবং অভ্যাস ত্যাগ করলে ও ক্ষমা চাইলে পাপ ক্ষমা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা অনুতাপকারীগণকে ভালবাসেন এবং যারা এ কথায় জোর দেয় যে, যে কোন উপায়ে হোক মানুষ পাপ হতে পবিত্র হয়ে যাক। বস্তুত প্রত্যেক অন্যায়ের সাজা দেয়া আল্লাহ্‌র ক্ষমাগুণের বিরোধী, কারণ তিনি মালেক" (চশমায়ে মারেফাত)।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "মানুষের পাপ ও ভুলত্রুটি যদি তওবা (অনুতাপ) করবার ফলে মোচন হয়ে যায় তবে এই তওবা তাকে ফিরিশ্‌তার চেয়েও অধিক উন্নত করতে পারে, কারণ ফিরিশ্‌তার মধ্যে উন্নতি করবার শক্তি নেই। মানুষের গুনাহ তওবার দ্বারা ক্ষমা হতে পারে। ঐশী হিকমত কোন কোন মানুষের মধ্যে ভুলত্রুটি করার ধারা অবশিষ্ট রেখেছেন, যেন সেই ব্যক্তি অন্যায় করে নিজের দূর্বলতা উপলব্ধি করতে পারে এবং পরে তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে পারে। মানবের জন্য এই নিয়মই নির্ধারিত করা হয়েছে এবং মানব প্রকৃতিও তা-ই চায়। ভুল-ভ্রান্তি মানুষের প্রকৃতিগত। ফিরিশ্‌তার প্রকৃতিতে তা নেই" (কিশতিয়ে নূহ)।

(৪) 'দ্বীন'– যা ধ্বংস করে গোমরাহ্‌কে। সমাজে প্রচলিত যত ধরনের নোংরামী ও গোমরাহী রয়েছে তা যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'লা নবী-রসূলদের প্রেরণের মাধ্যমে মিটানোর ব্যবস্থা করেছেন। সর্বশেষে ইসলাম ধর্মকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর মাধ্যমে জাতির কল্যাণার্থে অবতীর্ণ করেছেন। সূরা মায়েদার চার আয়াতে বলা হয়েছে, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (ধর্মকে) পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম।" মহান আল্লাহ্ তা'লা একমাত্র ইসলামকেই পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণতা আসতে পারে। সুন্দর সুষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। ধর্মের অনুশাসন ষোলআনা মানার মাধ্যমে সকল প্রকার গোরামী

ধ্বংস হয়। আল্লাহ্‌র হক্ ও বান্দার অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ধর্ম আমাদেরকে সু-পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

তবলীগে রেসালত এ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "হ্যাঁ, সেই মুবারক ধর্ম যার নাম ইসলাম, এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা পূরণ করে"।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেছেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁট হয়, আল্লাহ্ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অত:পর তার সৎকাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়ে সৎকাজ তার দশগুণ হতে সাতশতগুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত আর অসৎকাজ তার একগুণ মাত্র, তবে আল্লাহ্ যাকে ছেড়ে দেন (তার একগুণের শাস্তি হবে না)" (বুখারী)। সুতরাং ইসলাম ধর্ম বা দ্বীন আমাদেরকে যা শিখায় তার ওপর আমল করা উচিত। ইসলামের নিয়ামত থেকে কারোই পিছপা হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবু যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'ত হতে এক বিঘৎ পরিমাণও দূরে সরে গিয়েছে সে ইসলামের রশি আপন ঘাড় হতে খুলে ফেলেছে'। (আবুদাউদ, আহমদ)। ধর্ম আমাদেরকে মিলে মিশে জামা'তবদ্ধ হয়ে বাস করার শিক্ষা দেয়। যদি কেউ জামা'তের নিয়ামত থেকে ছিট্‌কে পড়ে তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য্য। সর্বদা ধর্মের আঁচলে তোমাদের আঁকড়িয়ে থাকা আবশ্যক।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কর্তৃক লেখা পুস্তক 'ইসলামী নীতিদর্শন' হতে জানা যায়, ইসলাম কী জিনিস? সেই জ্বলন্ত অগ্নি যা আমাদের তামস জীবনকে ভস্মীভূত করে এবং মিথ্যা উপাস্য বস্তুগুলিকে দগ্ধ করে সত্য ও পবিত্র আরাধ্য মা'বুদের সম্মুখে আমাদের জান-মাল ও সম্পদের কুরবানী উপস্থিত করে। এহেন উৎসে প্রবেশের ফলে আমরা এক নুতন জীবনের পানি পান করে থাকি এবং আমাদের সমগ্র রূহানী শক্তি আল্লাহ্‌র সাথে এমন ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায় যেমন এক আত্মীয় অন্য এক আত্মীয়েরে সাথে গভীর যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের আগুনের ন্যায় এক অগ্নি আমাদের অভ্যন্তর হতে বের হয়। আর এক অগ্নি উর্ধ্ব হতে আমাদের ওপর নিপতিত হয়। এই দুই অগ্নি শিখার সম্মিলনে আমাদের যাবতীয় পরকীয়া প্রেম ভস্মিভূত হয়। আমাদের প্রথম জীবনের মৃত্যু হয়। এই অবস্থার নাম কুরআন শরীফ অনুসারে ইসলাম"।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "সুতরাং পুণ্য কর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে কর্মে যে শিথিল হয়ে পড়বে তাকে ঘৃণিত দ্রব্যের ন্যায় মন্ডলী হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সাথে তার জীবনের অবসান ঘটবে" (কিশতিয়ে নূহ)।

মহান আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, আমাদের মুক্তির জন্য, নানাবিধ পাপ ও অকল্যাণ হতে বাঁচার জন্য সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। সামাজিক ভাবে আমাদের যত দোষত্রুটি আছে তা ইসলাম ধর্মে অনুসরণে ও আমলের মাধ্যমে সমাধা হতে পারে। আজ ধর্মের সুশিক্ষা জাতির মাঝে সঠিক ভাবে উপস্থাপন না করাতে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন বা ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। উগ্র মোল্লাদের আচরণে, মিথ্যা ফতওয়া ও জঙ্গীবাদের কারণে ইসলামের দূর্ণাম হচ্ছে। এই দূর্ণাম গুছাবার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লা শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দীকে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাকে 'হাকামান আদলান' ন্যায় বিচারক মিমাংসাকারী আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁর (আ.) জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য পুণরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে আহমদী জামা'তের বর্তমান (৫ম) খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ঐশী নেতৃত্বে সারা বিশ্বে ইসলাম তথা কলেমার দাওয়াত প্রচার হচ্ছে।

(৫) 'দুঃশ্চিন্তা' যা ধ্বংস করে জীবনকে। প্রায় প্রতিটি মানুষের মাঝেই দুঃশ্চিন্তার গ্লানি ভর করে থাকে। আর তা বিভিন্ন কারণবশত: হয়ে থাকে। অযথা দুঃশ্চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। দুঃশ্চিন্তার জন্য একটি মানুষের জীবনে অনেক ধরণের সমস্যাধী পরিলক্ষিত হয়। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ সর্বদা অশান্তিতে ভুগে। খাবারের প্রতি অনিহা দেখা দেয়। চলাফেরাতে অন্য মনস্ক দেখা যায়। বিভিন্ন রোগ শরীরের মাঝে প্রকাশ পায়। সংসারে কলহ-বিবাদ বৃদ্ধি পায়। কথার মধ্যে কোন রকমের মায়া-মমতা থাকে না। কর্কশ ভাষা ব্যবহার করে ইত্যাদি। এজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যাতে শত সমস্যার মাঝেও যেন নিজেকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত রাখতে পারে। আর এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বদা দোয়া প্রার্থনা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌ই পারেন মানুষকে সকল প্রকার ধ্বংস হতে রক্ষা করতে।

সমাজে বসবাস করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু মেনে চলা উচিত। মুসলমান হিসেবে অন্য মুসলমানের প্রতি পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ এ আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত। ইসলাম সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেয়। সমাজের সকল মানুষের প্রতি যদি আমরা ভাল সম্পর্ক রাখি তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকা যাবে। পবিত্র কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে, "মু'মিনরাতো (পরস্পর) ভাই ভাই। অতএব (বিরোধ দেখা দিলে) তোমরা তোমাদের দু ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দিও। আর আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়। (সূরা হুজুরাত: ১১)। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের শেষে "তুরহামুন" শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যদি আমরা মু'মিনদের মাঝে ঐক্য বজায় রাখি আর পরস্পর মিলেমিশে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যার ওপর বর্ষিত হবে তার মাঝে কোন ধরণের দুশ্চিন্তা থাকতে পারে না। উল্লেখিত আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি ঘটনা চক্রে দু'জন মুসলমানের মধ্যে বা মুসলমান দু'টি দলের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় তবে অন্যান্য মুসলমানের প্রতি এখানে নির্দেশ

দেয়া হলো যে, তারা যেন কাল-বিলম্ব না করে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দেয়।

ইসলামে আসল শক্তি এই ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা জাতি-বর্ণ কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে। এটি বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। যদি কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের দুঃখ-কষ্ট ও সংকট নিরসনে এগিয়ে যায় আল্লাহ্ তার বিপদ সংকটে সাহায্য করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব দু:খ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ্ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)।

দুশ্চিন্তা ও সামাজিক অশান্তি মূলে হলো 'হুকুকুল ইবাদ'-এর অভাব সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সহবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন।

একটি আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো সেখানকার লোকেরা পরস্পর প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, একে অন্যের কল্যাণ কামনা করবে, আপদে বিপদে পরস্পর সাহায্য করবে এবং সুখ-দুঃখের ভাগী হবে।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লিখিত পুস্তক, 'বিশ্ব শান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান'-এ বলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজে এখন নৈতিক আচরণের ওপর থেকে ধর্মীয় প্রভাব দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতিটার আরও অবনতি ঘটছে এই কারণে যে, ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য এমন একটা তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সমকালীন পৃথিবীর প্রায়ই সর্বত্রই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সমাজে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা থেকে একটা আতংকেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি নিষেধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রবণতার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবেই বিরাজ করছে। চিরঞ্জীব এক খোদার প্রতি যে বিশ্বাস, যে খোদা মানুষের শুধু ভাগ্যই নির্ধারিত করে দেন নি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্যাটার্ণ-পদ্ধতি নির্ধারণেরও অধিকার যাঁর আছে সেই খোদার প্রতি বিশ্বাস অতি দ্রুত ধ্বসে পড়ছে"। সুতরাং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলা জরুরী। তবে দুঃশ্চিন্তা হতে জাতি মুক্ত হবে।

দুশ্চিন্তা হতে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে:

(১) ঘৃণাবোধ থেকে দূরে থাকুন।

(২) অহেতুক দুশ্চিন্তা থেকে মনকে দূরে রাখুন।

(৩) সাদাসিধে জীবন যাপন করুন।

(৪) খুব বেশী প্রত্যাশা করবেন না। ও

(৫) সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ককে আরও বেশী মযবুত করুন।

(চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

সেটাই প্রকৃত ঈদ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে

মৌলবী এনামুল হক রনী

আল্লাহ্ তা'লা মানব প্রকৃতিতে হাঁসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় আমরা মানুষকে সবচেয়ে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি (সূরা ত্বীন)। কিন্তু এ সকল বৈশিষ্ট্যের মাঝে যে শক্তি সমূহের সন্নিবেশ করা হয়েছে তা হলো স্রষ্টার ইবাদত করা। কেননা মানব সৃষ্টির মূল লক্ষই হলো সৃষ্টির ইবাদত–'ওয়ামা খালাকতু জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লি ইয়াবুদুন।' আমি জিন্ন ও সাধারণ মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি (সূরা যারিয়াহ্)। তাই মানুষ সকল কাজে, সকল সময় এক স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিবেদন করবে এটাই স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়।

যখনই সুযোগ আসে, হোক সেটি আনন্দ প্রকাশের, হোক সেটি দুঃখ প্রকাশের, হোকনা কোন খুশি বা কান্নার তা যেন কেবল খোদার জন্য হয় আর ইবাদতে পরিণত হয়। মুসলমানদের ঈদ এমনই এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন বা সময়। যা বিভিন্ন ঘটনা যা ইবাদতের সম্বন্বয়ে আসে এবং যা কিনা ইবাদতের মাধ্যমেই এর বহির্প্রকাশ হয়। যতক্ষণ না এক বান্দা তাঁর স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিনীত ভাবে নিবেদন করে একথা না জানায় যে, প্রভূ! আমি তোমার সন্তুষ্ট নিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছি, আল্লাহ্ আকবার বলে বলে আমাকে তুমি কবুল কর।

আর এভাবে যখন একজন মুসলমান সারা বছর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করেন তাঁরই কাছে স্রষ্টার ইবাদতের জন্য ঈদ সবচেয়ে খুশি ও আনন্দের মুহূর্ত। এটা আসে অনেক কষ্ট ও সাধনার পরে, অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর পরে। তাই প্রকৃত ঈদ হয় একজন মু'মিন বান্দার জন্য স্বার্থক যখন এমনই কোন মুহুর্ত এসে যায়। তাই অবিরত চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় যেন স্রষ্টার সাথে সাধনার মাধ্যমে সেই খুশি ও আনন্দ আসে যা উভয়ের জন্য খুশির কারণ হয়। তখন স্রষ্টা বরেন, "সুতরাং আমার বান্দা হয়ে আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (সূরা ফজর) ।

যেহেতু মহান আল্লাহ্ পাক কুরবানীর মাধ্যমে তাঁকে লাভ করার অফুরন্ত সুযোগ আমাদের প্রদান করে থাকেন। তাই আমাদেরকে সেই সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হতে হবে। একথা জেনে বুঝে বা মনে করে স্রষ্টার বারিতে সিক্ত করি। আর তখনই আমাদের ঈদ হয়ে যায় প্রকৃত ঈদ। তখন বাহ্যিকভাবেও এটা দেখা যায়, যার প্রভাব পরিবেশ এবং কালের ওপর পতিত হয়। তখন নতুন কাপর পড়ে খুশবু লাগিয়ে সাজ গোছ করে যার যার সাধ্যানুযায়ী নিজেদের আনন্দগুলিকে প্রকাশ করা হয়। পরস্পরের মাঝে আবার তৌফার ব্যবস্থা করা হয়।

এভাবে ঈদ আসে ঘরে ঘরে আনন্দের প্লাবন উপভোগ করে সকলে মিলে সকলের তরে। নামায শেষে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কোলাকুলি করে আর মুখেও প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতার সেই সুর "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ। অর্থ আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ মহান এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য।

হাদীস শরীফ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) এই তকবীর পড়তে পড়তে ঈদগাহে যেতেন এক পথে এবং ফিরে আসতেন অন্য পথে। এভাবে ঈদের খুশিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঈদের দিন সদকা দান খয়রাত গ্রহণ করতেন। ঈদুল আযহাতে কুরবানী দিতেন। হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হযরত বেলাল (রা.) চাদর ধরে রাখতেন আর এ চাদরে নারী পুরুষ ঈদের দিনে ঈদ ফান্ড (সদকা খয়রাত করতেন)।

এযুগে আল্লাহ্‌র ফযলে হযরত রসূলে করীম (সা.) এর এই সুন্নতকে ধরে রাখার জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামা'ত, ঈদের দিন ঈদফান্ড কালেকশন করে থাকেন। আহমদীয়া সদস্য/সদস্যাগণ প্রত্যেকে সাধ্যমত এখাতে অর্থাৎ ইশায়াতে ইসলামের জন্য ঈদের খুশিতে স্বেচ্ছায় এ দান করে থাকেন। এভাবে একটি ঈদ আমাদের জন্য নানা খুশির দ্বার উন্মোচন করে দেয় মুসলমানদের ঘরে। তবে প্রকৃত ঈদ তো মহান স্রষ্টার ভালবাসা লাভ এবং স্রষ্টার সৃষ্টির সাথে ভালবাসার সম্পর্ক কায়েম করা। আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.) বলেছেন, "এটিই সেই প্রকৃত ঈদ যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে আমাদের উদযাপন করার চেষ্টা করা উচিত।" আল্লাহ্ পাক আমাদের এরূপ ঈদ পালনের তৌফিক দিন, (আমীন)।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

হুদায়বিয়ার ময়দান
হিজরতের ষষ্ঠ বছরে মহানবী (সা.) হজ্জের উদ্দেশ্যে নেয়া কুরবানীর পশুগুলোকে এই হুদায়বিয়ার ময়দানেই জবেহ্ করেছিলেন

ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব

“কুরবানী” অর্থ নৈকট্য লাভ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য লাভের বাহন। “ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার” (সূরা আল কাওসার) অর্থাৎ “তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী করো”। এই জগতে দেখা যায় প্রত্যেক নিম্নতর প্রাণী তার চেয়ে উচ্চতর প্রাণীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে। মানুষের উচিৎ তারা যেন তার চেয়ে উচ্চতর সত্ত্বা, তার প্রভু, তার স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে তার জীবনকেও কুরবানী করে।

ইসলামে কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ পাক প্রেরিত সকল ধর্মেই কুরবানীর নির্দেশ রয়েছে, তবে ইসলাম ধর্ম কুরবানীর শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করেছে। পবিত্র কুরআনে বহুবার মু’মিনদেরকে কুরবানীর নির্দেশ প্রদান করেছেন। এই নির্দেশসমূহ সূরা আল্-কাওসারের নির্দেশেরই প্রতিধ্বনী। এর অর্থ ত্যাগ, মহান আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম-নিবেদন। আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে মানবজাতির আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে মহান আল্লাহ্ কতিপয় আদেশাবলী দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে আদেশগুলি তিনি পূর্ণ করেছিলেন। সর্বশক্তিমান প্রভু ইব্রাহীম (আ.)কে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। উত্তরে তিনি (আ.) বলেছিলেন “ইন্নী আস্‌লাম্‌তু লিরাব্বিল আল্ আমীন”–অর্থৎ “আমি পূর্বেই সকল জগতের প্রভুর নিকটে আত্ম সমর্পণ করেছি।”

তাঁর ধর্মাদর্শই ছিল আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এমন আত্মসমর্পণের কারণেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাওয়া মাত্র তিনি (আ.) প্রিয়তমা স্ত্রী ও একমাত্র প্রিয় পুত্রকে জনমানবহীন মরুভূমিতে ছেড়ে আসতে পেরেছিলেন! শুধু তাই নয় আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ-আত্মসমর্পণের কারণেই প্রিয় পুত্রকে বাহ্যিকভাবে কুরবানী করতেও প্রস্তুত ছিলেন। কি অপূর্ব আত্মত্যাগ! কি মহান দৃষ্টান্ত! পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে পিতার কি অবিচল নিষ্ঠা এবং পুত্রের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি মানবাতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সময়ে "নরবলী দেবার" যে প্রথা ছিল, তা পশু কুরবানীতে বদলিয়ে দেয়া হলো। পশু কুরবানীকে ছাপিয়ে এটা আমাদের নফ্‌সের কুরবানী হয়ে উঠুক! কুরবানীকারী মন্দকর্মের নির্দেশদাতা "নফ্‌সে আম্মারাকে" আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচ্ছিন্নকারী ছুরি দিয়ে জবাই করে দেয়! অন্তরের তাক্‌ওয়া আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায়, কুরবানী মাংস রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছায় না!! কারণ রক্ত মাংস কুরবানীর শাঁস নয় বরং খোলস মাত্র, তা আত্মা নয় দেহ মাত্র! একজন প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে।" (মলফুযাত)

ধর্মের জন্য ১৩শ বছর পূর্বে মানুষ সর্বশক্তিমান খোদার পথে নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিতো। সেটাই ছিল প্রকৃত বড় ঈদ এবং এটাই ছিল প্রকৃত-সময় যখন জগতকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহ্‌গণ পবিত্র হজ্জ ও ঈদুল আযহার দিন যে কুরবানী করে থাকে তা কেবল আনন্দ ফুর্তিই নয়, তা হলো ইব্রাহীম (আ.) এর কুরবানীর একটি "প্রতীক দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো "তাক্‌ওয়া", যার প্রভাবে মু'মিন বান্দা নিজেকে পশুর ন্যায় কুরবান করতেও দ্বিধা করে না! কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই মু'মিনের মূল প্রাপ্তি।

কুরবানী বিভিন্ন ভাবে করা যায়। ধর্মের জন্য জান, মাল, সময়, ইজ্জত-সম্মান প্রয়োজনে কুরবান করতে হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, কারো আপন জীবদ্দশায় এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম।" আহমদীগণ এই নীতিতে অটল! তারা সমগ্র জীবন ব্যাপী কুরবানী করতে প্রস্তুত! কুরবানী ঈমান-রূপ-বৃক্ষকে সদা সজীব রাখে ও প্রতিষ্ঠিত জান্নাতের অধিকারী করে। হযরত রসূল করীম (সা.) এর সময়ে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) ইসলামের সেবায় তাঁদের সম্পদও কুরবানী করেছিলেন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের মাধ্যমে সেই কুরবানীকে পুনরায় মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

বর্তমান জামানায় আহমদীগণ সকল প্রকার কুরবানীতে অংশগ্রহণ করছেন। এ জামা'তভুক্ত আহমদীগণ একটি চলমান কুরবানী প্রক্রিয়ায়ার অংশ বিশেষ। আহমদীগণের এ পুরস্কার আল্লাহ্ বহুগুণ আকারে দিচ্ছেন এবং জারীও থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্! "হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন" –অর্থাৎ "পুণ্য অর্জন হতে পারে না যে পর্যন্ত আপন প্রিয় জিনিস আল্লাহ্‌র পথে তাঁর ধর্মের প্রচার এবং তাঁর সৃষ্ট জীবগণের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ খরচ না করো।" নিজ দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করা যা বাঙ্গালী জাতি এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা সচেষ্ট ছিল। শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে সকল আহমদী ধর্মের জন্য শহীদ হবার মর্যাদা পেয়েছেন তাঁদের সকলের এ কুরবানী আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করুন এবং পুরস্কৃত করুন (আমীন)।

অতএব ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম। আলহামদুলিল্লাহ্ ॥

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি লোম এক একটি পূণ্য, যা খোদার কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য করে

ইসলামে ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করার গুরুত্ব ব্যাপক। যদিও সামর্থহীন অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী ওয়াজীব নয় কিন্তু সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব। মহানবী (সা.) 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষে নিজেও কুরবানী করতেন এবং তার সাহাবীদেরকেও কুরবানী করার জন্য তাগিদ দিতেন। এই ব্যাপারে হাদীসে অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে-যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.) হিজরতের পর মদিনায় দশ বৎসর অবস্থান করেন এবং তিনি প্রতি বৎসরই 'ঈদুল আযহা' উপলক্ষ্যে মদীনায় কুরবানী করতেন" (তিরমিযী)।

শুধু তাই নয়, 'ঈদুল আযহার' কুরবানীর প্রতি তাঁর (সা.) এতদূর খেয়াল ছিল যে, তিনি ওফাতের পূর্বে তাঁর জামাতা ও পিতৃব্য পুত্র হযরত আলী (রা.)কে ওসীয়্যত করেন যে, তাঁর পরেও (ওফাতের পর) যেন তাঁর পক্ষে ঈদুল আযহা' উপলক্ষ্যে সর্বদা কুরবানী করা হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, "হযরত হাবসা (রা.) বলেন, তিনি হযরত আলীকে দেখলেন 'ঈদুল আযহা'-য় দুটি দুম্বা কুরবানী করছেন। তিনি হযরত আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "দুই দুম্বা কুরবানী করার কারণ কি? হযরত আলী (রা.) বললেন যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) ওসীয়্যত করেছেন, যেন তিনি তাঁর পক্ষে তাঁর ওফাতের পরেও কুরবানী করতে থাকেন। এই জন্য তিনি হযরত রাসূল (সা.) এর পক্ষে কুরবানী করেন" (আবু দাউদ)।

ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করা মহানবী (সা.)-এর শুধু ব্যক্তিগত কর্মই ছিল না, বরং তিনি তাঁর সাহাবাদেরকেও এর তাহরীক করতেন। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, "হযরত বারা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.) ঈদুল আযহার দিন খুতবা দেন এবং বলেন, এই দিন প্রথমে মানুষ ঈদের নামায পড়বে এবং তার পর কুরবানী করবে। সুতরাং যে এইরূপে করে সে তাঁর (সা.) সুন্নতকে লাভ করেছে" (বুখারী ও মুসলিম)। আরেক

স্থানে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন "যার আর্থিক সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঈদুল আযহা উপলক্ষে কুরবানী করে না, সে কেন আমাদের ঈদগাহে এসে নামাযে শামিল হয়?" (মুসনাদ আহমদ)। হযরত রাসূল করীম (সা.া) এর এই কথাকে সাহাবারা (রা.) খুব ভালভাবেই স্মরণ রেখেছিলেন এবং সাধ্যমত কুরবানী করতেন।

রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, জাবল ইবনে সহীম বলেন, এক বার এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈদুল আযহার কুরবানী কি জরুরী'? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে কুরবানী করতেন এবং তাঁর অনুবর্তিতা রূপে সাহাবাগণও কুরবানী করতেন। ঐ ব্যক্তি তার প্রশ্নটি পুনরুত্থাপনপূর্বক বললেন, কুরবানী কি ওয়জিব? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বললেন, "তুমি কি আমার কথা বুঝতে পার না? আমি বলি যে, রাসূলুল্লাল্লাহ্ (সা.) নিজেও কুরবানী করতেন এবং তাঁর অনুবর্তীতায় অন্য মুসলমানরাও করতেন" (তিরমিযী)।

শুধু ব্যক্তিগত শখ অথবা বন্ধু-বান্ধব এবং দরিদ্রদেরকে গোশ্‌ত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যেই রাসূল (সা.) এ জ্ঞান করতেন না, বরং তিনি একে একটি ধর্মীয় কাজ জ্ঞান করতেন এবং পূণ্যজনক মনে করতেন।

যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে, যায়েদ বিন আরকাম (রা.) বলেন, রাসূল করীম (সা.) এর সাহাবারা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ্, ঈদুল আযহার এই যে কুরবানী, এটি কেন করা হয়? হযরত রসূল (সা.) বললেন, এটি তোমাদের প্রধান পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীমের প্রবর্তিত রীতি (সুন্নত)।

সাহাবারা বললেন, তবে আমাদের জন্য এতে লাভ কি? তিনি বললেন, 'কুরবানীর জন্তুর প্রত্যেকটি লোম কুরবানীকারীর জন্য এক একটি পূণ্য, যা তাকে খোদার কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য করবে" (ইবনে মাজা)। হযরত আয়েশা (রা.) রেওয়ায়েত করে বলেন, মহানবী (সা.) ঈদের কুরবানী সম্বন্ধে বলতেন "খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ঈদুল আযহার দিন মানুষের অন্য কোন কর্ম কুরবানীর জন্তু জবেহ্ করা অপেক্ষা প্রিয়তর নয়।" (তিরমিযী)। উপরোক্ত হাদীসগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে, কুরবানীর গুরুত্ব কত ব্যাপক। কুরবানীর আদেশ রয়েছে বলে যে কোন ধরনের পশু কুরবানী করলেই চলবে না। কুরবানীর পশু নিখুঁত হওয়া চাই, এই ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসেও উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে তাঁর রাস্তায় কুরবানী করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

কুরবানীর রক্ত ও মাংস আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলামের কোন কাজ কোন অনুষ্ঠানই উদ্দেশ্যহীন নয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য। আর উপাসনার পদ্ধতি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। পবিত্র কুরবানী তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা মুসলমানরা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর অনুসরণে কুরবানী করে থাকি। পবিত্র কুরআন অতীতের যাবতীয় উত্তম ও উৎকৃষ্ট শিক্ষাকে সংরক্ষণ করেছে এবং আগামীতেও এমন কোন শিক্ষা আবিষ্কৃত হবে না যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয় নাই। এ দাবী পবিত্র কুরআনের ঐশীগ্রন্থ হওয়ার অসাধারণ প্রমাণ। অবশ্য এটা ঠিক যে, মানুষ তার চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তথ্যগুলো বুঝার যোগ্যতা অর্জন করবে বা আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের মাধ্যমে তা মানবজাতিকে বুঝাবো। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কুরবানী পশু কুরবানী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর অন্তরালে যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা তাই ছিল আসলে কুরবানীর প্রাণ।

কুরবানীর প্রথা পূর্বেও প্রচলিত ছিল; তবে ক্রমান্বয়ে তাতে বিকৃতি আসে এবং মানুষ নরবলীর প্রথাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। নরবলী প্রথা লোপ করানোও ছিল ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে পশু কুরবানীর একটি উদ্দেশ্য। আসলে স্ত্রী-পুত্র হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ.)কে নির্জন মরু প্রান্তরে মক্কার উপত্যকায় জনমানবহীন অবস্থার নির্বাসন দেওয়া। আর তা ছিল আল্লাহ্‌র আদেশকে শিরোধার্য করে নেওয়ার এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ। পশু কুরবানীর উদ্দেশ্যের ব্যাপকতাও ইনশাআল্লাহ্ সুদূর প্রসারী তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলকে শির্‌ক মুক্ত করতে গাভী জবাই করার আদেশ দেওয়ায় তাদের যে তালবাহানা তা আমরা পবিত্র কুরআনে পাঠ করে থাকি।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ বলেন– বল আমার জীবন, আমার মরণ, আমার কুরবানী সবই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সমগ্র জীবনই ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিত ও কুরবানী কৃত। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাস ও আশেকে সাদেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আমরা যার হাতে বয়আত করেছি তিনিও তাঁর নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন–আমরা যেন আমাদের জান, মাল, ইজ্জত সর্বস্ব আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদা কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকি এবং কার্যত এ সবের যাবতীয় কুরবানী আল্লাহ্‌র সমীপে করি।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, ইসলামী প্রথা ও অনুষ্ঠানাধী বাস্তব

বিবর্জিত। তাই কুরবানীর পশুকে হজ্জের প্রাক্কালে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা ও তার দুধ পান করা নিষিদ্ধ নয়। পৌত্তলিকরা তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে উট ইত্যাদি বেওয়ারিশ ছেড়ে দিত এবং এদের দ্বারা কোন কাজ নেওয়া ও এদের দুধ পান করা হতেও বিরত থাকতো।

কুরবানীর মূল হল তাক্‌ওয়া যদিও এর মাধ্যমে সামাজিক ও বৈশ্বিক কল্যাণ সাধনও নিহত। পবিত্র কুরআন বলে কুরবানীর রক্ত ও মাংস আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না। আল্লাহ্‌ যা গ্রহণ করেন তা নিয়্যত ও তাক্‌ওয়া বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– কুরবানীর পশু জবাই-এর পর যখন ঢলে পড়ে তখন নিজেরাও খাও এবং স্বল্পে তুষ্ট অভাবীদেরও খাওয়াও। বৃহত্তরের জন্য ক্ষুদ্রের কুরবানী প্রাকৃতিক বিধান।

আমাদেরও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে অবশ্যই পার্থিব কুরবানী পেশ করে তা অর্জন করতে হবে। বিনিয়োগ ছাড়া যেমন ব্যবসা সম্প্রসারিত হয় না, বীজ বপন না করলে যেমন ফসল উৎপন্ন হয় না, সে সবের অন্তরালে আল্লাহ্‌র হস্ত কার্যকর তেমনি কুরবানীও আল্লাহ্‌ নির্ধারিত এক মহান পবিত্র পদ্ধতি যা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইসলামে কার্যকর। ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব অপরিসীম তবে তা নিয়্যত ও পবিত্রতা এবং তাক্‌ওয়ার মানে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে পর্দা করা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) বলেন-

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যারা বলে, ইসলামে মুখমন্ডল ঢাকার কোন আদেশ নেই আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, কুরআন করীম তো বলে, সৌন্দর্য গোপন রাখ। আর সবচেয়ে সৌন্দর্যের জিনিস হলো মুখমন্ডল। মুখমন্ডল ঢাকার যদি আদেশ না থাকে তাহলে সৌন্দর্য আর কি জিনিস যা ঢাকার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে? নিঃসন্দেহে আমরা এ সীমা পর্যন্ত মানতে পারি, মুখমন্ডলকে এভাবে ঢাকা হোক যেন এর সুস্থতার ওপর কোন মন্দ প্রভাব না পড়ে, যেমন পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়া হয় অথবা আরবী মহিলাদের রীতি অনুযায়ী নিকাব বা ঘোমটা বানিয়ে নেয়া যায়, যাতে চোখ ও নাকের নথ যুক্ত থাকে। কিন্তু মুখমন্ডলকে পর্দার বাইরে রাখা যেতে পারে না।" (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) পর্দার বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরো বলেন– "কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত ইসলাম সম্মত পর্দা হচ্ছে মহিলাদের চুল, গর্দান ও কানের আগা পর্যন্ত চেহারা বা মুখমন্ডল ঢেকে রাখা, এই আদেশ পালন করতে বিভিন্ন দেশে তাদের অবস্থা ও পোশাক অনুযায়ী পর্দা করা যেতে পারে।" (আল ফযল ৮ নভেম্বর, ১৯২৪)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"মসজিদের সাথে কেমন হবে আমাদের সম্পর্ক।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মজলিস আনসারুল্লাহ মিরপুরে সফলতার সাথে "সীরাতুন নবী (সা.) জলসা" অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রোজ শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর এর উদ্যোগে "সীরাতুন নবী (সা.) জলসা" সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

মাগরিব ও এশা নামায একত্রে বাজামাত আদায় করার পর কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদ্বোধন করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ । কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌলবী হাফেজ আবুল খায়ের, দোয়া পরিচালনা করেন জনাব বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। "হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়ত পূর্ব জীবন" শীর্ষক সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব আবু নাসের আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব ফিরোজ আহমদ।

অত:পর অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম সদর সাহেব আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, ইসলাম বিদ্বেষীরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনের ওপর কালিমা লেপন করে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই মহানবী (সা.)-এর মহান ও উচ্চ মর্যাদাকে নিজেদের অজান্তেই খাটো করে চলছে। এ প্রেক্ষাপটে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠিত নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর নির্দেশ প্রতিপালনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বের সর্বত্র অধিকতর হারে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসার আয়োজন করে মহানবী (সা.)-এর শান ও মর্যাদার আলোকিত ও উজ্জল মহান আদর্শ তুলে ধরার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মজলিস আনসারুল্লাহ, মীরপুর এর আজকের এ অনুষ্ঠানটি এরই ধারাবাহিকতার ক্ষুদ্রতম একটি প্রয়াস।

সদর সাহেব উপস্থিত মেহমানদের স্বাগত জানিয়ে মহানবী (সা.)-এর মহান জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান।

এরপর আমাদের দেশে সমকালীন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তপূর্ব জীবন ও নবুয়ত পরবর্তী জীবনের কতিপয় ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে মুবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য রাখেন এবং বিশদভাবে জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন থাকলে তা উত্থাপন করতে শ্রোতাদের আহ্বান করেন।

এরপরই নানাবিধ প্রশ্ন আসতে শুরু করে। অত:পর রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ প্রাণবন্ত এক প্রশ্নোত্তর আলোচনা চলে। মেহমানদের মধ্যে আরও বিশদভাবে জানার আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ায় আগামী ১৮ অক্টোবর, ২০১৪ পুণরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হবে বলে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়।

প্রায় ৭০ জন নন-আহমদী মেহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর দেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, ভাইস প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। শেষে এক জন মেহমানের বয়আত গ্রহণ ও দোয়ার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের মধ্য দিয়ে সীরাতুন নবী (সা.) অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে পৌঁছে, আলহামদুলিল্লাহ! এতে ২০০জন উপস্থিত ছিলেন।

আবু জাকির আহমদ

বিষ্ণুপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ১২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ বিজয়নগর উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে বাইতুল ফযল মসজিদে বিষ্ণুপুর মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা মহা সমারোহে আধ্যাত্মিক আনন্দ ঘন পরিবেশে সংগঠনের যয়ীম আমীর মাহমুদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ভূঁইয়ার কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনাদর্শ নিয়ে বক্তৃতা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রিজিওনাল যয়ীম মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, বিশেষ অতিথি এসএম হাবিবুল্লাহ, মৌলবী আব্দুস সালাম, জসিম উদ্দিন মিয়াজী, শফিকুল আলম বাবু প্রমুখগণ।

যয়ীম আনসারুল্লাহ, বিষ্ণুপুর

কৃতী ছাত্রী

* আমাদের একমাত্র মেয়ে শারমিন সুলতানা রয়েল, ২০১৪ সনের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে গোল্ডেন A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য দোয়া কামনা করছি।

মোহাম্মদ জালাল আহমদ ও হাসিনারা জালাল
খাকদান

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেরগাতীর প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলীর জ্যৈষ্ঠ কন্যার ঘরের নাতনী মোছাঃ রোকসানা আহমদ সূচনা ২০১৪ সনের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে GPA 5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, তেরগাতী

সন্তান লাভ

গত ২৯ আগষ্ট, ২০১৪, রোজ শুক্রবার মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ছোট মেয়ে রাফিকা মোবাশ্বেরা এবং মোহাম্মদ মোবাশ্বের আলীকে এক পুত্রসন্তান দান করেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) দয়াপরবশ হয়ে তার নাম রেখেছেন 'উসমান আলী'। হুযূর (আই.) তাকে ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভূক্ত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করে জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

এম. এ. করীম ও আমেনা করীম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ভাদুঘর হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, রোজ শনিবার বাদ মাগরিব মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ভাদুঘর হালকা নামায ঘরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নেয়ামত উল্লাহ্, হালকা, প্রেসিডেন্ট, ভাদুঘর। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব শাহ আলম, হালকা যয়ীম, ভাদুঘর এবং উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসীম আহমদ, হালকা যয়ীম, মৌড়াইল ও মোন্তাযেম তবলীগ, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মুহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মহানবী (সা.)-এর কর্মময় জীবনের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। শেষে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় ৮৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

মজলিস আনসারুল্লাহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তালিমুল কুরআন ক্লাস ও বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ

গত ০৮ জুন ২০১৪ তারিখ হতে মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়া, মৌড়াইল ও ভাদুঘর এই তিনটি হালকায় তালিমুল কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষকতা করেন মওলানা সামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মৌলবী আবু তাহের, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার ও জনাব মোশারফ হোসেন।

আহমদী পাড়ায় ভোর রাত্রে বেদারীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এখানে মোট ১৫জন সম্মানিত আনসার সদস্য ক্লাসে যোগদান করেন। মৌড়াইল হালকায় প্রত্যহ বাদ মাগরীব ক্লাস শুরু হয়। এতে মোট ১২জন আনসার সদস্য যোগদান করেন। ভাদুঘর হালকায় বাদ মাগরীব ক্লাস আরম্ভ হয়। এই হালকায় মোট ৮জন আনসার সদস্য ক্লাসে যোগদান করেন।

১৩/০৬/১৪ইং তারিখ শুক্রবার শেষদিন ভোর রাত্রে প্রতিটি হালকায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। সর্বমোট ৪০জন মুসুল্লী নামাযে উপস্থিত ছিলেন। মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ, কায়েদ তালিম, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর উপস্থিতিতে বাদ জুমুআ পবিত্র কুরআন ক্লাসে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিযোগিতা মুলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

এতে মোট ১৯জন আনসার অংশগ্রহণ করেন। সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল ৩ ঘটিকায়। এতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ, কায়েদ তালিম, মজলিস আনসারুল্লাহ,বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ।

উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব শাহজাদা খান। নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব আবু তালেব। পুরস্কার প্রদান করেন জনাব মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক আহাদপাঠ ও দোয়া পরিচালনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে, বিকাল ৫ঘটিকায় স্থানীয় কবরস্থানে কিছু বনজ বৃক্ষের চারা রোপন করে বৃক্ষরোপন সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ, কায়েদ তালিম, মজলিস আনসারুল্লাহ,বাংলাদেশ। উপস্থিত সবাইকে প্রত্যেকের বসত বাড়ির আঙিনায় ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা লাগানোর অনুরোধ করে দোয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি হয়।

রিজিওনাল নাযেম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের দাঈ ইলাল্লাহ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের তিনদিন ব্যাপী দাঈ ইলাল্লাহ প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১৩ সেপ্টেম্বর সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

চট্টগ্রামের স্থানীয় আমীর প্রিন্সিপাল জনাব মোমেন বিল্লাহর সভাপতিত্বে সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মুহাম্মদ হাসান এর সঞ্চালনায় এবং স্থানীয় মুরব্বী সিলসিলাহ মওলানা জাফর আহমদ মূল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. দেলোয়ার হোসেন, নযম পাঠ করেন মৌ. মোহাম্মদ সেলিম। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে চট্টগ্রাম, বাঁশখালী, কুটিরহাট, অম্বর নগর, দেবকরা, পটিয়াসহ প্রভৃতি এলাকা থেকে ৯০ জন দাঈ ইলাল্লাহ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কোর্সে মুসলমানের সংজ্ঞা, খাতামান নবীঈনের প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন মৃত্যু প্রসঙ্গ, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের ওপরে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীস সমূহের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তিন দিন ব্যাপী উক্ত ক্লাশে ৩০/৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত থাকেন।

দোয়ার মাধ্যমে ক্লাশের সমাপ্তি ঘটে।

মুহাম্মদ হাসান

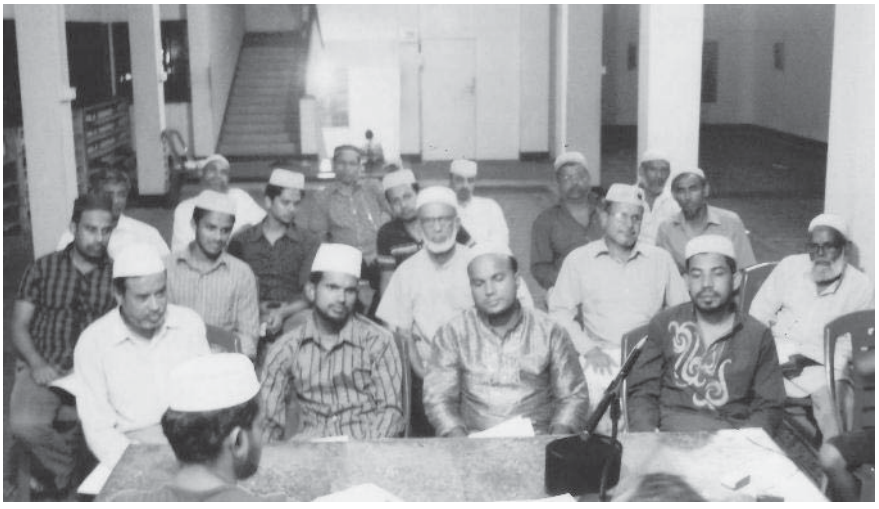

লাজনা ইমাইল্লাহ মিরপুরের ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বিগত ২২ ও ২৩শে আগষ্ট ২০১৪ রোজ শুক্র ও শনিবার ২ দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ, মিরপুরের ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্ল--াহ। বাদ জুমুআ কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান, নায়েব আমীর -১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাসেরা আকরাম।

'কুরআন পাঠ ও এর ওপর আমল করার গুরুত্ব' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন রোখসানা বশির। বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন মাহমুদা মাহমুদ, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ, মিরপুর। 'পার্থিবতার ওপরে ধর্মকে গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে খলিফা ওয়াক্তের দিক নির্দেশনা' বিষয়ের ওপর জ্ঞান গর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন সাদেকা হক। এ ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলা নযম পাঠ করেন নাবিলা চৌধুরী ও উর্দু নযম পাঠ করেন আয়েশা আমিন ।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, কুইজ ও খেলাধুলা প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাহমুদা ইসলাম, ডাঃ পারভীন হাকিম আনোয়ার ও দেলোয়ারা আক্তার ডলি।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নাসেরা আকরাম। বিশেষ অতিথী ছিলেন সদর সাহেবার প্রতিনিধি রেহেনা খায়ের, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমায় প্রায় ২৫০জন নাসেরাত ও লাজনা অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার মাধ্যমে ২০তম বার্ষিক ইজতেমা শেষ হয়।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

লাজনা ইমাইল্লা ফাজিলপুরের সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ০৫/০৯/২০১৪ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মিসেস মোস্তারিনা আকতার। কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস আমাতুল মজিদ। রসূল করীম (সা.) এর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নারীর মর্যাদায় নবী করীম (সা.), খানাপিনায় সরলতা, শত্রুদের সাথে আচরণ, উত্তম চরিত্র ও খোদা তা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা, ইত্যাদি বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করেন যথাক্রমে ফারহানা রেজোয়ানা, আমাতুর মাজিদ, আমাতুর মতিন, সাজিদা আকতার ও আমাতুল মজিদ। অনুষ্ঠানের শেষে তালীম পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী নাসেরাতদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আমাতুল মজিদ

ঘাটুরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ০৬/১০/২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে বাদ মাগরীব সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ আলামীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রহীম আহমদ হাজারী। নযম পাঠ করেন জনাব এম, এম, নইমুল্লাহ্। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুছা মিঞা, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা। মওলানা তারেক আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, জনাব এস, এম হাবীবুল্লাহ্, সহকারী রিজিওনাল নাযেম ও জেলা নাযেম এবং রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ আলামীন ও জেলা নাযেম।

সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এস, এম হাবীবুল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ আগষ্ট রোজ রবিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে দিনব্যাপী ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

ইজতেমা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধি খুরশিদ জাহান, সেক্রেটারী তরবিয়ত, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ফারহানা আহমদ শীলা। ইজতেমার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আরজিনা আক্তার। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মাকসুদা ফারুক। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

সবশেষে পুরস্কার বিতরণ, দোয়া ও আহাদনামা পাঠের মধ্য দিয়ে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪২৬ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

শামীমা আক্তার লিলি

মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চাঁদা আদায় আশারা পালন

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশের বাৎসরিক কর্মক্যালেন্ডারের নির্দেশানুযায়ী গত ১লা থেকে ১০ মে, ২০১৪ পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্যেগে চাঁদা আদায় আশারা পালন করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট অঞ্চলের রিজিওনাল নাযেম জনাব মোশারফ হোসেন ও জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীমে আলা মজলিস আনসারুল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নেতৃত্বে গ্রুপ করে প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায় আহমদী পাড়া (উত্তর-দক্ষিণ), কাজী পাড়া, মৌলভী পাড়া, মৌড়াইল ও ভাদুঘর হালকায় চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যে ঘরে ঘরে যাওয়া হয়। এতে ভাল সাফল্য এসেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবকটি হালকা থেকে বেশকিছু পরিমাণ চাঁদা আদায় হয়েছে। আরো অনেক সম্মানিত আনসার সদস্য আগামী মাসে চাঁদা পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

রিজিওনাল নাযেম

ভাল অভ্যাস গড়ে তুলুন, সুস্থ থাকুন

** খাবারের আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে দুই হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন। নিয়মিত নখ কাটুন। অপরিষ্কার হাত ও নখ নানাবিধ মারাত্মক রোগের কারণ।*

** বিশুদ্ধ পানি পান করুন। ডাইরিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েডের মতো অনেক মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুন। বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন।*

** রক্তস্বল্পতা গর্ভবতী মা ও শিশুর একটি মারাত্মক সমস্যা যা মৃত্যুও ঘটাতে পারে। রক্তস্বল্পতা রোধে রঙ্গীন ও টাটকা শাকসবজি এবং ফলমূল বিশেষ উপকারী।*

** নবজাত শিশুকে শালদুধ খাওয়ান এবং ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ দিন। মায়ের দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।*

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের ২১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ২৩.০৮.২০১৪ রোজ শনিবার ২১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ৯-৩০ মিনিটে শুরু হয়। সভানেত্রী ছিলেন দিলরুবা বেগম মায়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাদেকা হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নার্গিস ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া। ইজতেমায় দোয়া ও আহাদনামা পাঠ করেন সভানেত্রী সাহেবা। অত:পর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। ইজতেমায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দিলরুবা বেগম মায়া। নযম পেশ করেন খাওলাদ্বীন উপমা এবং বুশরা আক্তার। অত:পর ইজতেমায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন উম্মে কুলসুম চায়না। ইজতেমার বক্তৃতা পর্বে ঃ 'তবলীগে সফলতার চাবিকাঠি' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জুয়েল বেগম দিবা। 'বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে পর্দা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন হামিদা আকবর এবং হুযূর (আই.) এর লাজনাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন সাজেদা রশিদ। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ইজতেমায় উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায়। এতে সভানেত্রী ছিলেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাওলাদ্বীন উপমা। নযম পেশ করেন যথাক্রমে বুশরা আক্তার, সুলতানা নাছিরা ও তাহমিনা ফয়েজ মিতু।

অতঃপর সন্তানদের তালীম তরবিয়ত মায়েদের ভূমিকা এ বিষয়ে বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ডা. শিমুল আহমদ। প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন প্রধান অতিথি। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মাসুমা শামীম। সমাপনী অধিবেশনে সভানেত্রীর মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ মোট ১৯২ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ও গভীর বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, বিগত ১৭ মে, ২০১৪ তারিখে আমার পিতা জনাব জালাল উদ্দিন খাদেম, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি অত্যন্ত সরল ও মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি চাকুরী সূত্রে দীর্ঘ ৫৫ বছর চট্টগ্রাম অবস্থান করেছেন। চট্টগ্রাম দক্ষিণ হালিশহর হালকা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি দীর্ঘদিন দক্ষিণ হালিশহর হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। পরবর্তীতে সেই হালকায় বহু লোক আহমদীয়াতে সামিল হন। তিনি নিজ এলাকায় কর্মস্থলে অত্যন্ত আস্থাভাজন এবং অমায়িক ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। তার সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও মিশুকতার কারণে নিজ এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তার বাসায় বহু আহমদী ভাই পড়ালেখা ও থাকা-খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। যারা আজ যার যার অবস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি নিস্বার্থভাবে আহমদী, অ-আহমদী ভাইকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। যারা তার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তারা তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

তিনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে চকবাজার মসজিদ দূরে থাকা সত্ত্বেও কোন শুক্রবার তিনি জুমুআর নামায বাদ দেননি। তিনি নিয়মিত চাঁদা আদায়কারী ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার কোনও চাঁদা বকেয়া ছিল না। খেলাফত ও জামা'তের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। চলতি বছরের শুরুতেই তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন এবং মাদারটেক মসজিদ সংলগ্ন বাড়িতে বাসা ভাড়া নেন। অল্প ক'দিনেই তিনি মাদারটেক এলাকায় আহমদী ভাইদের কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

তার মরদেহ চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়া হয় এবং মুরাদপুরস্থ জামা'তের নিজস্ব কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। তার জানাযায় বহু অ-আহমদী ভাই শরিক হন। এছাড়া চট্টগ্রামের যে এলাকায় তিনি থাকতেন সেই এলাকার তার পরিচিত বহু অ-আহমদী তাই তার মরদেহ দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদের অনুরোধের প্রতি সম্মান জানিয়ে তার মরদেহ চট্টগ্রামের নয়া বাজার এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র ও দুই নাতী-নাতনী রেখে যান। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনদের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

রাশেদ আহমদ খাদেম
মরহুমের ছেলে

দৃষ্টি আকর্ষণ

আমরা অবগত হয়েছি যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহকগণ নিয়তিমভাবে পত্রিকা পান না।

অথচ আমাদের বিভাগ থেকে যথাসময়ে পত্রিকা গ্রাহকদের হাতে পৌঁছানোর জন্য পোষ্ট করা হয়ে থাকে। তারপরেও কেন গ্রাহকগণ পত্রিকা যথাসময়ে পাচ্ছেন না সে সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই।

এমতাবস্থায় আমাদের পরামর্শ হলো, নিজ নিজ এলাকার ডাক বিভাগের সাথে আপনারা সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন। হয়তো এতে কাজ হতে পারে।

-প্রকাশক

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, সম্প্রতি আমেরিকা হতে একজন আহমদী আমাকে পত্রে লিখেছেন যে, জলসার বক্তৃতায় আপনি নবাগত আহমদীদের ঈমান আনার যেসব ঘটনা শুনিয়েছেন তা শুনে আমার মনেও সাধ জাগে হায়! আমার জীবনেও যদি এমন কোন ঘটনা ঘটত তাহলে তা আমার ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হত। এর কিছুক্ষণ পরই এক মহিলা তাকে ফোন করে বলেন, আমি ওয়েব সাইটে আপনার নাম্বার পেয়েছি।

আহমদীয়াতের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ রয়েছে, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। অনুমতি পেয়ে সেই মহিলা অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে যখন আসেন তখন জানা যায় যে, ইসলামের প্রতি আগ্রহের কারণে তার কট্টর খিস্টান স্বামী ও শ্বশুর বাড়ী তাকে ছাড়তে হয়েছে এমনকি আইনের মাধ্যমে তার সন্তান দু'টিকেও কেড়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনভাবেই সত্যের আঁচল পরিত্যাগ করেননি। বরং আহমদীয়াত গ্রহণের মাধ্যমে খোদা তাকে সত্য পথের দিশা দিয়েছেন বলে তিনি কৃতজ্ঞ।

এই ঘটনা দেখে সেই পত্র লেখকের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে বলে, এ ঘটনা আমার জন্যও ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। কেননা, আগে আমি মনে করতাম যেসব ঘটনা শোনানো হয় এগুলো কল্প-কাহীনি নতুবা এতে অতিরঞ্জন রয়েছে। কিন্তু আজ বুঝা গেল যে, আসলেই খোদা তা'লা সত্যের অনুকূলে বায়ু প্রবাহিত করছেন আর এর ফলে সদাত্মারা সত্যের কোলে আশ্রয় নিচ্ছেন।

হুযূর বলেন, যেসব তরুণের মনে এধরণের ধারণা তাদের জেনে রাখা উচিত, যা কিছু বলা হয় এতে কোন অতিরঞ্জণ নেই। বরং এমন ঘটনার সংখ্যা হাজার কিন্তু শোনানো হয় মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি।

এরপর হুযূর বিভিন্ন দেশে যেসব নবাগত আহমদী শুধুমাত্র খোদার কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে বা দোয়ার ফলে সত্য স্বপ্ন দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন তাদের বিবরণ তুলে ধরেন। এদের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং দূরপ্রাচ্যের দেশ অস্ট্রেলিয়ার আহমদীরাও অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ আজও খোদার কাছ থেকে সত্যের দিশা পাচ্ছেন এবং সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে তা লালন-পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

হুযূর বলেন, এসব ঘটনা শুধুমাত্র সাময়ীক আনন্দ লাভের জন্য শোনা উচিত নয় বরং এর থেকে আহমদীদের শিক্ষা নেয়া উচিত। এতে আমাদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায় তা পালনের প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদের সবাইকে নিজ নিজ জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা উচিত। খোদা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা শিরোধার্য করে বিশ্বময় সত্যের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের ঈমান দুর্বল থাকুক তা খোদা চান না, তাই তিনি নিজের পক্ষ হতে প্রতিদিন নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর আমার সমর্থনে উপর্যুপরি নিদর্শন দেখাচ্ছেন। বিরোধিদের সকল উদ্যোগ- আয়োজন ব্যর্থ করেছেন। যারা সত্য সন্ধানী তারা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেও বিরুদ্ধবাদীরা বলে এগুলো প্রকাশ্য জাদু।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যদের ঈমান দুর্বল থাকুক তা খোদা চান না, তাই তিনি নিজের পক্ষ হতে প্রতিদিন নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন আর আমার সমর্থনে উপর্যুপরি নিদর্শন দেখাচ্ছেন। বিরোধিদের সকল উদ্যোগ- আয়োজন ব্যর্থ করেছেন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সৎকর্ম ছাড়া ঈমান মূল্যহীন। তাই এ যুগে আমরা যারা যুগ ইমাম এবং নবীকে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছি তাদের উচিত সকল প্রকার সৎকাজে অগ্রগামী থাকা।

আজ যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে। ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ বলে দাবী করে তাদের কর্মকান্ড এবং আচার-ব্যবহার প্রমাণ করে যে, তাদের এই দাবী বুলী সর্বস্ব। এরা সৎকর্মতো দূরে থাক ইসলামের নামে এমনসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে বেড়ায় যে, আজ বিশ্বসমাজে ইসলাম সম্পর্কে একটি ভীতি বিরাজ করছে।

এরা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ পরিত্যাগ করে মনগড়া ইসলাম উপস্থাপন করে আর উগ্রতা ও কট্টরতা অবলম্বন করেছে। এরাই আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য পরস্পরের ওপর যুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কোনো অপকর্ম নাই যা তারা করছে না।

বর্তমান যুগে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই ঈমান আনার পাশা-পাশি সৎকর্ম করছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঈমানের সঙ্গে সৎকর্মকে যুক্ত করে দিয়েছেন। যেভাবে একটি গাছ সার-পানির মাধ্যমে চির সবুজ-সতেজ থাকে একইভাবে সৎকর্ম মানুষের ঈমানকে মজবুত ও সুদৃঢ় করে।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারা খোদার রহমতের ছায়ায় থাকবে। তারা এমন জান্নাতে বসবাস করবে যার তলদেশ দিয়ে নব-নদী প্রবাহিত হবে। ঈমান আনার পর যারা সৎকাজ করে তারা পবিত্র জীবন-জীবিকা লাভ করে। তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকে না আর তারা দুঃখিতও হবে না। আর পরকালের বিষয়েও কোন আশংকা থাকবে না, কেননা তারা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান পাবে। আবার বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে খোদা তাদের হৃদয়ে গভীর ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি করবেন। তারা মানবহিতৈষী হবে। তারা ফলবান গাছের মত হবে। তারা সুশোভিত থাকবে এবং গরমের সময় পথচারীদের ছায়া দিবে। অর্থাৎ সবদিক থেকে তারা মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হবে। তাদের হৃদয়ের গভীরে মানুষের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

প্রকৃত মু'মিন কখনো কাউকে কষ্ট দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না। অন্যের অধিকার খর্ব করা বা কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার তো প্রশ্নই উঠে না। তারা সর্বদা মানুষের হীত কামনা করে।

হুযূর (আই.) বলেন, প্রকৃত মু'মিন কখনো কাউকে কষ্ট দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না। অন্যের অধিকার খর্ব করা বা কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার তো প্রশ্নই উঠে না। তারা সর্বদা মানুষের হীত কামনা করে।

হুযূর (আই.) বলেন, আজ ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা হলে মুসলমান দেশগুলোতে এমন ভীতিকর ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি আমাদের দেখতে হতো না।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাবলী হতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে বলেন, আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে ছায়াদার গাছের মত হতে হবে। আপন-পর সবাই যেন আমাদের কাছ থেকে কল্যাণ পেতে পারে।

হুযূর আফ্রিকার একটি দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, সেখানে আহমদীয়া মসজিদ উদ্বোধনের সময় স্থানীয় খ্রিস্টান চীফকেও নিমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি দেখতে আসেন যে, এরা আবার কেমন মুসলমান? মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে দেখেন যে, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা এখানে এসেছেন। তিনি আহমদীয়া জামা'তের বক্তব্য শুনে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে আমার যে ভীতি বা সন্দেহ সংশয় ছিল তা আজ দূর হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের এলাকায় শুধু একটি মসজিদ-ই বানাননি বরং আমাদের মাঝে নব প্রাণেরও সঞ্চার করেছেন।

এই হলো আমাদের আদর্শ। আর এমনটিই হওয়া উচিত। যাতে আমাদের আদর্শে মানুষ অনুপ্রাণিত হতে পারে। আমাদের আচার-আচরণ দেখে যেন মানুষ ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

যেভাবে অতীতের মুসলমান রাজত্বে বসবাসকারী ইহুদী খ্রিস্টানরা পর্যন্ত মুসলমানদের অধীনস্থ থাকা পছন্দ করতো। মুসলমানদের ন্যায়-বিচারে মুগ্ধ হয়ে তারা ইসলামী রাজত্বের জন্য দোয়া করতো। আজ আমাদেরও অনুরূপ করার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, শুধু বয়আত করাই যথেষ্ট নয়। তোমাদের যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সে মোতাবেক জীবন পরিচালিত করো। কাজ করার ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে হবে। দেখতে হবে যে কাজ করছ তা খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে কি না? আর সকল ক্ষেত্রে খোদাকে ভয় করো। যে খোদাকে ভয় করে সে-ই উত্তম। এর ফলে সে গভীর অন্তঃদৃষ্টি লাভ করে আর এর আলোকে সে পাপ এড়িয়ে চলতে পারে। মনে রাখবে, সেই সত্যিকার অর্থে ভালো যে খোদার দৃষ্টিতে ভালো। আর খোদার দৃষ্টিতে যে মুত্তাকী সেই প্রকৃত খোদাভীরু।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মু'মিনদের শ্রেণীভুক্ত করুন। যাদের দেখে মানুষ আকৃষ্ট হবে আর তারা হবে সত্যিকার অর্থে মানবহিতৈষী।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বুর্কিনাফাঁসোর কায়া অঞ্চলে দ্বিতীয় সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বুর্কিনাফাঁসোর কায়া অঞ্চল গত ২২শে মে, ২০১৪ তারিখে দ্বিতীয় সর্বধর্ম সম্মেলন আয়োজনের সৌভাগ্য লাভ করে। এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য গত ৪মাস থেকে প্রস্তুতি নেয়া হয়। সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করে তাদেরকে এই সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সম্মেলনের জন্য স্থানীয় একটি হোটেলের হল বুক করা হয় এবং তা বিভিন্ন ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করা হয়। ওয়াগাডুগু হতে জামা'তের ন্যাশনাল আমীরের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল সেখানে গমন করেন। এবছর এই সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, The dignity of woman। এই সম্মেলনে জামাতের নিমন্ত্রণে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চ, প্যাগানস এবং বাহাই ধর্মের প্রতিনিধি সহ মোট ৫টি ধর্মের প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং মূল বিষয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে বক্তব্য পেশ করেন।

প্রশাসনের উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গভর্ণর ও মেয়রের প্রতিনিধি। এছাড়া রাষ্ট্রদূত, পুলিশ ও আর্মির নেতৃবৃন্দ, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, সকল ধর্মের আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সাধারণ মানুষ।

অনুষ্ঠানের মডারেটর জনাব কাবুরে সুলেমান সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন। এরপর ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চের প্রতিনিধি, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের প্রতিনিধি ও বাহাই ধর্মের প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়া ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের রিজিওনাল মিশনারী মোকাররম হামেদ মাকসুদ আতেফ সাহেব বক্তব্য রাখেন। এরপর গভর্ণর সাহেবার প্রতিনিধি তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে গভর্ণরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান এবং এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন। জামা'তের আমীর সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ইসলামী শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সমাজের সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নীরব দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এতে মোট ৫৪৫জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের বার্ষিক ইজতেমা সফলভাবে অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের বার্ষিক ইজতেমা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন সকাল ১১.৩০টায় পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এরপর সদর খোদ্দাম, আহাদনামা পাঠ করান। নযম পাঠের পর জামাতের আমীর মোহতরম জাকারিয়া খান সাহেব খোদ্দামদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানান এবং তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন। নীরব দোয়ার মাধ্যমে যথারীতি ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা আরম্ভ হয়।

রীতি অনুসারে বিভিন্ন ধর্মীয় ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে খোদ্দাম ও তিফলরা অংশগ্রহণ করে।

অপরাহ্ন ৬ টায় সমাপনী অনুষ্ঠান পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। এরপর ডেনমার্কের সদর সাহেব, খোদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন এবং মোহতরম আমীর সাহেব বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাজিলের প্রথম মসজিদের ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ৭ই জুন, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাজিলের প্রথম মসজিদের ***ঐতিহাসিক*** ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান হয়েছে। হুযূর (আই.) এই মসজিদের নামকরণ করেছেন "বাইতুল আউয়াল"। এ বিষয়ে যে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাটি উল্লেখের দাবী রাখে তাহলো, জামাতের জমিটি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। আইন অনুসারে এখানে কোন পাবলিক ভবন নির্মাণের অনুমতি নেই। কিন্তু এরপরও কাউন্সিল আমাদের অনুমতি দিয়েছে। কারণ আমাদের জামাত একটি শান্তিপূর্ণ সংগঠন। উক্ত অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কানাডার মুবাল্লিগ ইনচার্জ মওলানা মোবারক আহমদ নযীর সাহেবকে প্রেরণ করেন।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার প্রায় ৭০ জন প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিভিন্ন কাউন্সিলর, পাদ্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বে অর্থাৎ ৬ই জুন শুক্রবার একটি টিভি চ্যানেল STB আমাদের মিশন হাউস পরিদর্শন করে এবং প্রায় ২০ মিনিট সাক্ষাতকার গ্রহণ করে। এছাড়া দু'টি জাতীয় দৈনিকও এই অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতে হুযূরের বিশেষ বাণীও পাঠ করে শোনানো হয়। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এবং মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব আল্লাহ্ তা'লা এবং উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তুলে ধরে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন। হুযূরের সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা মোবারক আহমদ নযীর সাহেব মর্মস্পর্শী নীরব দোয়া করান। স্থানীয়রা মসজিদের ভিত্তিতে ***ইট স্থাপনকে*** নিজেদের জন্য ***অনেক বড়*** সম্মান বলে উল্লেখ করেন। ***অত্যন্ত*** সফলতার সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় আর এ উপলক্ষে সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হয় এবং সম্মানিত অতিথিদের মাঝে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়।

জার্মানীর তবলীগ বিভাগ ডিটজেনবাখ, মরফেল্ডেন ও স্টুহর ব্রিঙ্কুম শহরে অ-আহমদী অতিথিদের নিয়ে ঈদ সম্পর্কিত বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন

আগস্ট মাসের ৯ ও ২০ তারিখে জার্মানীর তবলীগ বিভাগ ডিটজেনবাখ, মরফেল্ডেন ও স্টুহর ব্রিঙ্কুম শহরে অ-আহমদী অতিথিদের নিয়ে ঈদ সম্পর্কিত বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক অতিথির সঙ্গে স্থানীয় মেয়রগণও উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় আহমদীরা অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এরপর মঞ্চ থেকে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। এ সময় আহমদীয়া জামাতের পরিচিতিমূলক একটি প্রামান্যচিত্র পরিবেশন করা হয়। জামাতের সম্মানিত মিশনারীগণ রমযান মাসে এবং ঈদুল ফিতরে ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে সম্মানিত অতিথিরা ইসলামের শিক্ষা, রোযা, জিহাদ এবং আহমদীয়া জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। সংশ্লিষ্ট জামাতে কর্তব্যরত মুবাল্লিগগণ এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নৈশভোজেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এমটিএ'র সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে অতিথিরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে এসব অনুষ্ঠান যে, জাতীকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি মোক্ষম সুযোগ তাও তারা অনুভব করেছেন।

বেলজিয়ামের HERVE শহরে লাজনা ইমাইল্লাহ্, ইউপেন এর উদ্যোগে চ্যারিটি ওয়াক এবং চ্যারিটি স্টলের আয়োজন

গত ২৮শে জুন, ২০১৪ তারিখে বেলজিয়ামের HERVE শহরে লাজনা ইমাইল্লাহ্, ইউপেন এর উদ্যোগে একটি চ্যারিটি ওয়াক এবং চ্যারিটি স্টলের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় Le Toit নামক একটি সমাজ কল্যাণ সংগঠনকে সহায়তা প্রদানের জন্য এর আয়োজন করা হয়। জানুয়ারী থেকেই এর আয়োজন শুরু হয়। একটি লিফলেট প্রস্তুত করা হয় যাতে জামাতের পরিচিতি এবং সৃষ্টিসেবায় আহমদীয়া জামাতের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। এছাড়া এই আয়োজনকে সফল করার লক্ষ্যে শত শত বিজ্ঞাপন মানুষের ঘরে ঘরে, স্কুল, গির্জা এবং নগর বিভাগের লোকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

২৮শে জুন খোদ্দাম ও আনসারদের সহায়তায় নির্ধারিত স্থানে পাকিস্তানী খাবার, হস্তশিল্প, অলংকার ও মেহেদী লাগানোর স্টল খোলা হয়। সকাল সাড়ে ৯ টায় ৫কি:মি: ব্যাপী এই পদযাত্রা আরম্ভ হয় এবং ১১টা নাগাদ শেষ হয়। এতে মোট ৬০জন অংশ গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৩জন লাজনা, ১৩জন খোদ্দাম ও আনসার আর বাকী সবাই ছিল স্থানীয় বেলজিয়ামের নাগরিক। এই পদযাত্রা ও স্টলের মাধ্যমে সর্বমোট ২৩৭৬ ইউরো তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

স্টল হতে জামাতের পরিচিতি মূলক লিফলেটও বিতরণ করা হয়। এসময় দর্শনার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়, এভাবে স্থানীয় লোকদের কাছে আহমদীয়াতের শিক্ষা ও আদর্শ তুলে ধরার সুযোগ ঘটে।

এছাড়া গত ১৩ই মে আয়শা হালকা ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথভাবে চ্যারিটি ওয়াক করে এবং উম্মুক্ত স্থানে চ্যারিটি স্টল খোলে। গত ২মাস ধরে এই স্টল খোলার জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এন্টরপেন মিশন হাউসের বাইরে ব্যানারও লাগানো হয়েছিল। ১৫জন লাজনা পদযাত্রায় অংশ নেয় আর ৮জন লাজনা স্টলে ডিউটি প্রদান করে। এই আয়োজনের মাধ্যমেও অনেকের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছানোর সুযোগ ঘটে। এছাড়া চ্যারিটি স্টল হতে সংগৃহীত ১৫০ ইউরোসহ মোট ২২০৬ ইউরো তহবিল সংগ্রহ করা হয় বলে সূত্র জানিয়েছে।

দু'সপ্তাহের জন্য সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত মাহমুদ মসজিদকে শান্তির পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত

দু'সপ্তাহের জন্য সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত মাহমুদ মসজিদকে শান্তির পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

আমীর সাহেব তার সাক্ষাতকারে বলেন, "শুরুর দিকে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম কীভাবে মিনারটিকে আমরা শান্তির রং দ্বারা সুসজ্জিত করবো। এই পরিকল্পনাটি আসলে একটি বিপনন সংস্থাকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে আমরা নিজেরাই কাজটি করতে সক্ষম হই এবং ব্যাপকভাবে এর থেকে লাভবান হই। এই পরিকল্পনাটি সুইস জনগোষ্ঠীকে মিনারের প্রয়োজনীয়তা এবং শান্তির সঙ্গে এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে এক বিশাল ধারণা প্রদান করছে। এই পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি অনেক মানুষের ইমেইলও পেয়েছি। এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তারাও এই পরিকল্পনার ভূয়ষী প্রশংসা করেছেন। একজন আমাকে লিখেছেন, 'আমার মনে হয় শান্তির লক্ষ্যে কেবলমাত্র আপনারাই শেষ ভরসা'।

এই পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ববাসীকে জানানো যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং মসজিদ একটি উপাসনার স্থান এবং এর দরজা সবসময় খোলা আছে পারস্পরিক সংলাপ, ভাতৃত্ব এবং আলোচনার জন্য।

পাশাপাশি স্থানীয় এবং জাতীয় গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া উভয়-ই এই পরিকল্পনার সংবাদ ফলাও করে প্রচার করেছে, যার ফলে আমাদের জামা'তের এই সূচনা লক্ষ্য মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে নির্বিঘ্নে।

দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান এবং শান্তির বাণী প্রচারে ইউকে

'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একমাত্র মূলমন্ত্র এটি, যা মুলত দুঃস্থদের সহায়তা প্রদান এবং শান্তির বাণী প্রচারের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। ন্যাশনাল চ্যারিটি চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মানবতার খাতিরে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ১২ই জুলাই, ২০১৪ তারিখে এমনই একটি তহবিল সংগ্রহের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে যার নাম বার্ষিক Tilford Village উৎসব, যা অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যের Surrey তে অবস্থিত টিলফোর্ড কাউন্সিলের মাঠে।

এই অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয় স্থানীয় Tilford উৎসব কমিটির উদ্যোগে, এ বছর ৪০০জন স্থানীয় বাসিন্দা পুরো একটি দিন এই উৎসব মুখর অনুষ্ঠানে অংশ্রগহণ করেন।

আয়োজক এবং সেচ্ছাসেবী সরবরাহের মাধ্যমে গত কয়েক যুগ ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদ শাখা এই আয়োজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মওলানা মুনির উদ্দীন শামস, যিনি ইসলামাবাদ জামাতের একজন সদস্য এবং Tilford Parish Council এর একজন সম্মানিত কাউন্সিলর। তিনি এই উৎসবে আহমদীয়া জামা'তের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি তিনি ইসলামাবাদ স্টলেরও দেখাশোনা করেন, যা দুঃস্থদের জন্য আর্থিক তহবিল সংগ্রহ করে। এবং এই তহবিল থেকে এ বছর এই উৎসবেও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৪০টি স্টল এবং বিভিন্ন মজাদার ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, অপরদিকে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহকৃত তবিল দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয়।

এই উৎসবে ঞরষভড়ৎফ এলাকায় অবস্থিত স্থানীয় Weydon School এর শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করে এবং তহবিল সংগ্রহ করে, যা স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নতুন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে মানবহিতৈষী কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে। জামা'তের মাধ্যমে আয়োজন করা হোক কিংবা বাইরের কোন সংগঠনই আয়োজন করুক না কেনো জামা'তের সদস্যরা উৎসাহের সাথে এতে অংশগ্রহণ করে থাকে যা শান্তি ও বিশ্বমানবতার কল্যাণে সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ডেনমার্কে বিশেষ উৎসবের আয়োজন

ডেনমার্কের Nakskov (নাক্সকোভ) শহরে প্রতিবছর একটি উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়। গত ১লা আগস্ট রোজ শুক্রবার চলতি বছরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের আমন্ত্রণে আহমদীয়া জামা'তও এই উৎসবে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ করে। এর মধ্যে শহরে অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় পরিদর্শনেরও আয়োজন করা হয়।

১লা আগস্ট বিকেল পৌনে তিনটায় নাক্সকোভ শহরের পর্যটন কেন্দ্রের প্রতিনিধি খরংব ঝরসড়হ ৪০জনের অধিক একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমাদের বাইতুল মাহদী মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। এসময় জামা'তের সদস্যগণ এবং স্থানীয় মুবাল্লিগ নেয়ামত উল্লাহ্ বাশারাত সাহেব তাদের স্বাদর অভ্যর্থনা জানান। এরপর মুবাল্লিগ সাহেব ইউরোপে মসজিদ নির্মাণে আহমদীয়া জামা'তের ভূমিকা কি তা তুলে ধরেন। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক নির্মিত কয়েকটি প্রাচীন ও বৃহৎ মসজিদের ছবি প্রদর্শন করে ইউরোপে ইসলাম সেবায় আহমদীয়া জামা'ত কি করছে তা বর্ণনা করেন।

এরপর অভ্যাগতদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, এতে তারা ইসলাম ও আহমদীয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। যেমন, জিহাদ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা কী? ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, আহমদীয়া জামা'ত এবং অন্যান্য ইসলামী ফির্কাগুলোর মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায়? বিবাহ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা কী? এবং ইসলামে শাস্তির বিধান কীরূপ এসব সমকালীন প্রশ্ন ছিল উল্লেখযোগ্য।

নাক্সকোভ জামা'তের মুবাল্লিগ সাহেব এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। সবশেষে অতিথিদের মাঝে পাকিস্তানী ও আলবেনিয়ান সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়।

অধিকাংশ অতিথিই এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পর্যটন কেন্দ্রের প্রতিনিধি ইমেইলের মাধ্যমে এই আয়োজন সফল হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনটি প্রত্রিকায় এই পরিদর্শন সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

"যদি কেউ পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সে কুরআনের অবমাননা করে"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

THE TIMES OF INDIA
September 3, 2014

The War Within Islam

"I do not regard the Ahmediyyas as Muslims", says a female medical student emphatically to me, emphasizing that they are kaffirs and should not be regarded as Muslims at all. What shocks me is that it is a female student at the medical faculty of Copenhagen University who says this in September 2014. Our conversation just happened to have got diverted, and when I got to know she was a Muslim, I told her in simple enthusiasm that I had just returned from London after having attended the second-largest convention of Muslims on the globe, arranged by Ahmediyyas. When I asked her why she does not believe that Ahmediyyas are Muslims, she says, "It is simple, I am a follower of the Wahhab faith".

Wherever you go, you are confronted with this ongoing war within Islam. Abu Bakr-al-Baghdadi is claiming to be Khalifa, steering one version of Islam, the so-called ISIS or daish. This is the Wahhabist version. Baghdadi is spreading the reign of fear in the Middle East after having conquered a vast region of Iraq and Syria. There is very little choice for the inhabitants of the Islamic State. Follow the Salafist, Wahhabist version of Islam or die. Baghdadi and his followers believe that other Muslims, like the Shia followers, or other streams of Islam that respect saints, or Sufism, or those who worship idols, are practicing "bida". Bida is forbidden by God and hence they can be executed, beheaded or killed. The world now knows that two American journalists have been beheaded by followers of this particular version of Islam.

To the Salafists and Wahhabists the period in which the Prophet Mohammed lived in Medina is holy. And no deviation from what they consider the true faith is tolerated. On the contrary, it is sanctioned with death punishment and confiscation of property. Therefore it is legitimate to rob banks, etc.

There is another Khalifa, whose teachings were made public in 1889. He is the promised Messiah and founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, which has now spread to more than 200 countries in the world. This version of Islam was born in India, started by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. Therefore his followers are also sometimes known as Qadianis. They believe that Lord Krishna was also a prophet and that Jesus had been in India. They democratically elect a Khalifa, whom they now call their huzoor - the beloved. Huzoor or Hazrat Mirza Masroor Ahmad, who is their present Khalifa, has millions of followers around the world, a community of highly educated doctors and engineers. While attending their annual international gathering in London, I was surprised by the educational titles of those serving food. One of them was an aeronautical engineer, but it is doing service - khidmad, as they say in Urdu, which is of primary importance. All are equal in the eyes of Allah, they believe.

It is a well-known fact that Ahmediyyas are one of the most persecuted groups, who are subject to violence and exclusion in many Islamic countries, despite the fact that the first Nobel prize in the world won by

a Muslim went to an Ahmaidiyya follower, Abdus Salam. Ahmediyyas are constantly persecuted, they are subjected to discrimination and not even allowed to vote in Pakistan. The level of threat on their Khalifa is so immense that he is constantly surrounded by body guards. It was a privilege to meet Huzoor Hazrat Mirza Masroor Ahmad, who speaks wonderful Urdu/Hindi, and who told me to come and visit him again when all those 33,000 guests had gone and there was less rush. It was amazing to dine with a Khalifa. The person who sat next to Huzoor was Prakash Ramdhar, a Hindu, the Minister of Legal Affairs in the government of the Republic of Trinidad and Tabago. This is tolerance and compassion. A unique experience for me to dine facing a Muslim Khalifa sitting and dining with a Hindu.

The Ahmediyyas' motto is: Love for all, hatred for none. This is another version of Islam. There is one Khalifa, Abu-Bakr Baghdadi, who has taught that people like me are kaffirs who should be killed and punished, and there is another Khalifa who says that I should come and meet him.

I offered my first Namaz-Muslim prayer in my life, with my heart, with thousands of others, where Huzoor was leading the prayer.

We now see this clash within Islam, where one version preaches love and acceptance of others, and another version preaches beheading and butchering of those who are different. The Muslims in the world will have to choose what kind of Khalifa deserves their honour and respect.

No, Samuel Hungtington was not entirely correct in his prediction. We are not witnessing the clash between civilizations. We are witnessing a clash within Islam, or call it a clash within civilizations. What is your take on it?

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স ওয়েবপেজ ডিজাইন (HTML, CSS, Wordpress)

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

"রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার, রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলান্নারা ফাকাদ আখ্‌যাইতাহু ওয়ামা লিয্ যোয়ালিমিনা মিন আনছার"

অর্থ : হে আমাদর প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসবকে (আকাশমালাসহ বিশ্বজগৎ) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করেছ অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার, তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 6 & 7 Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th October, 2014 Tk. 40.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরাঁ

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com